আজকের সমস্যাবলী

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

আজকের সমস্যাবলী

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

ভাষান্তর

মলয় চট্টোপাধ্যায়

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

AAJKER SAMASYABALI

Bengali translation of Rahula Sankrityayan's
Aaj Ki Samasyen

© কমলা সাংকৃত্যায়ন

প্রথম সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০০৫ ॥ আশ্বিন ১৪১২

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অক্ষরবিন্যাস
কম্পোজিট
৩৪/২ বাজেশিবপুর রোড, হাওড়া ৭১১ ১০২

মুদ্রাকর
এস. এস. প্রিন্ট
৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

ISBN 81-85696-63-2

দাম ৪০ টাকা
(Rs. 40.00)

সূচিপত্র

নিবেদন - ৭
প্রকাশকীয় - ৯
পাকিস্তান অথবা জাতি সমস্যা - ১১
মাতৃভাষার সমস্যা - ৩৬
প্রগতিশীলতার প্রশ্ন ৪৮
আজকের সাহিত্যিক ৫৬

নিবেদন

এই রচনা সংকলনটিতে রাহুলজির তিনটি প্রবন্ধ এবং একটি লিখিত ভাষণ সংকলিত করা হয়েছে। প্রবন্ধ তিনটিই 'হংস' নামে একটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং ভাষণটি ১৯৪৪-এ মধ্য ভারত ফ্যাসি বিরোধী লেখক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ রূপে পঠিত হয়েছিল।

প্রবন্ধগুলি কিছু পুরানো হলেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি বলেই আমার ধারণা এবং সেজন্যই ওই চারটি লেখাকে সংকলিত করায় ব্রতী হয়েছি।

প্রয়াগ — নাগার্জুন

৫.৮.৫৪

প্রকাশকীয়

আজকের সমস্যাবলী বইটি পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নের তিনটি প্রবন্ধ এবং একটি লিখিত ভাষণের সংকলন। ১৯৪৪-এর সেই ঝোড়ো দিনে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। বিস্ময়ের বিষয়, এই বইটির ভূমিকা রাহুলজি লেখেননি, লিখেছেন তাঁরই বন্ধু সাহিত্যিক নাগার্জুন। প্রবন্ধগুলি একটি বিশেষ সময়, বিশেষ অবস্থার বিশ্লেষণ করে লেখা। প্রবন্ধগুলি একটু পুরানো হলেও রাহুলজির রচনা- বৈশিষ্ট্য, তাঁর দৃঢ় লেখনী এবং সুবিন্যাস্ত যুক্তিজাল রচনাগুলিকে আজও প্রাসাঙ্গিক করে রেখেছে। যে সমস্যা নিয়ে তিনি কলম ধরেছিলেন, আজ তাঁর লেখার ছয় দশক পার হয়ে যাবার পরও সেই সমস্যা ছায়ার মতো আমাদের অনুসরণ করে চলেছে। এই অবস্থায় বইটি যেমন প্রাসাঙ্গিক তেমনই পাঠকদের অন্যভাবে ভাবতেও আহ্বান জানায়।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

(৯. ৪. ১৮৯৩ — ১৪. ৪. ১৯৬৩)

পাকিস্তান অথবা জাতি সমস্যা

পাকিস্তান বিষয়টি আজকাল তার সমর্থক এবং বিরোধী; এই দুইরূপে, প্রতিটি শিক্ষিত ভারতবাসীকে আকর্ষিত করছে। বেশ কিছু লোক একে প্রতিক্রিয়াশীল, জাতীয়তাবিরোধী নেতৃত্বের দেশদ্রোহ, ইত্যাদি ধুয়ো তুলে একেবারে ধ্বংস করে দিতে চায়। আবার অনেকে মনে করে ভারতবর্ষের জাতি সমস্যারই এক বাস্তব ছবি হিন্দুস্থান-পাকিস্তান। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে বর্তমান সময়ে জাতি সমস্যা—যার মধ্যে অনিবার্যভাবে পাকিস্তান প্রসঙ্গটিও এসে পড়ে—শুধুমাত্র আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ নয় পৃথিবীর অনেক দেশকেই এই সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে বা হচ্ছে।

জাতি কি?

(১) জাতির পরিচয়—কোনো ব্যক্তি-মানুষের জাতি পরিচয় জানার সর্বাপেক্ষা প্রধান ও কার্যকরী উপাদান হল ভাষা। বেশভূষা ইত্যাদি দিয়েও জাতি পরিচয় নির্ণয় করা যায়, তবে বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশভূষা আর জাতীয় না হয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে। হ্যাট, কোট, প্যান্ট ইত্যাদি আজ আর শুধুমাত্র ইওরোপীয় পোশাক নয়, আজ এই বেশভূষা প্রায় সর্বত্রই বহুল প্রচলিত। এজন্য শুধু বেশভূষা দিয়ে কোনো জাতির পরিচয় নির্ণয় করা সর্বাংশে সম্ভব নয়। বিশেষ ধরনের খাদ্যাভ্যাসও কিছু পরিমাণে জাতি পরিচয় বহন করে। বাঙালিরা মাছ ভাতের ভক্ত, পাঞ্জাবিরা দুধ, ঘি, রুটি ইত্যাদিকেই সর্বোত্তম খাদ্য বলে মনে করে, তামিলদের খাবারের থালায় পোয়াটাক সবজির সঙ্গে সেই পরিমাণ লংকা ও তেঁতুলের মিশ্রণ না হলে তার কাছে খাবারের স্বাদ পানসে লাগে। গুজরাটিদের বেলাতে ডাল রান্না করে তার মধ্যে গুড় অথবা চিনি ঢালতে হয়। বিহারিদের সবজি-তরকারি ডুবো তেলে ভাজা হওয়া চাই, আলু, বেগুনের ভর্তাতে কাঁচা সরষের তেল চাই-ই চাই। পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মানুষ মুগ কিংবা কলাইয়ের ডালের সঙ্গে ভাজা পাঁপড়ের পাপড়ি খুব পছন্দ করে। লংকা খাওয়ার ব্যাপারে মাড়োয়াড়িরা তামিলদেরও বলে ওদিকে থাকতে। বাল্যকাল থেকে মানুষ যে ধরনের খাদ্য খেয়ে অভ্যস্ত, স্বাভাবিক ভাবেই সেই খাদ্যের প্রতি এক বিশেষ রুচির জন্ম হয়। এজন্য বাঙালি যদি আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরেও থাকে, সেখানেও ভাজা মাছের নামে তার জিভে জল আসবে। আমার এক মুসলমান বন্ধু, কিছুদিন আমার সঙ্গে ইরানে ছিল। ইরানে মসলা বিহীন সাদামাঠা ধরনের রান্না করা মাংস ভাত খেয়ে এতদূর হতাশ হয়ে গিয়েছিল যে সে এক ফতোয়াই ঘোষণা করে ফেলেছিল যে 'খানা (খাদ্য) এবং গানা (সংগীত) এই দুইয়ের প্রকৃত সমঝদার একমাত্র হিন্দুস্থানিরাই।'

গানের মধ্য দিয়েও এক ধরনের জাতীয় রুচি তৈরি হয়। আমাদের মধ্যেকার অনেক শিক্ষিত, রুচিবান ভারতীয়ও ইওরোপের প্রথিতযশা গায়ক গায়িকাদের গানকে দু-মিনিটের

বেশি বরদাস্ত করতে পারে না। যাদের সংগীতে ইওরোপ আমেরিকা মহাদেশের কোটি কোটি মানুষ উদ্বেল হয়ে ওঠে, তাদের প্রতি অবহেলা দেখায়, ব্যঙ্গ করে। এরকম করার সময় তারা অবশ্যই ভুলে যায় যে আমাদের সংগীতও অন্য জাতির মানুষের কাছে সমভাবেই উপহাসের সামগ্রী হতে পারে। খাদ্যের মতো সংগীতের প্রতিও রুচি তৈরি করতে হয়। যে সমস্ত ভারতীয়দের দীর্ঘকাল ইওরোপে বসবাস করার ফলে সেখানকার আহার্য পানীয়তে মোটামুটি একটা রুচি জন্মেছে, ঠিক সেভাবেই ইওরোপীয় ঘরানার সংগীতের প্রতিও আমাদের একদিন রুচি জন্মাতে পারে। একথা বলার উদ্দেশ্য একটাই যে বেশভূষা, আহার্য ইত্যাদির মতো সংগীতও জাতীয় সীমা পার হয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পারে। তবে এই সব কিছু সত্ত্বেও সংগীত ও খাদ্য, একটা সীমা পর্যন্তই জাতীয়তার পরিচয় বহন করে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

জাতীয়তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় বহন করে ভাষা। ভাষা এমন একটি চিহ্ন, যা শুধু আমাদের ভাবাবেগের উপরেই নির্ভরশীল নয়। জাতীয় উত্থান-পতনের সঙ্গে ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।

আয়ারল্যান্ডে আইরিশ জাতির মতো বিশ্বের আরও অনেক জাতি তাদের জাতীয় উত্থানের সোপানরূপে ব্যবহারের জন্য সে-দেশের মৃতপ্রায় জাতীয় ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। একটি জাতির উত্থানে ভাষা কতটা সহায়ক হয়ে উঠতে পারে, পরবর্তী পর্যায়ে সে-বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনা করা হবে।

জাতির ব্যক্তিত্ব বিকাশে ভাষা ব্যতীত আরেকটি বস্তুও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তা হল ধর্ম। এখানে আমরা সংস্কৃতিকে ধরছি না, কারণ সংস্কৃতি হল ভাষা, সাহিত্য, কলা ও ধর্মের সম্মিলিত সৃষ্টি। অনেকে আছেন যাঁরা জাতি বিষয়ক আলোচনা কালে ধর্মকে পাশে সরিয়ে রাখতে চান। তাঁরা মনে করেন যে ধর্ম কোনো স্থায়ী বিষয় নয়। সোবিয়েত তুর্কিস্তানের মানুষ এক সময় কট্টর মুসলমান ছিল। আজ সেখানে সামান্য কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই ইসলামের সবরকম অনুশাসন মেনে চলে। জীবনে ইসলামের ভূমিকা কম হওয়ার কারণে তাজিক, উজবেক, তুর্কমান আর কিরঘিজরা কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র জাতি সত্তাকে হারিয়ে ফেলেনি। আজ তাদের জাতীয় সংস্কৃতি—ভাষা, সাহিত্য, কলা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যা দেখে অনেকেই ধর্মকে জাতীয়তার সঙ্গে একাসনে বসাতে অনিচ্ছুক হন। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি হয় সুদূর অতীতে না হয় আগামী ভবিষ্যতে। বর্তমানের কঠিন কঠোর বাস্তবাবস্থা থেকে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে চান। যে দেশে ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ তার ভাষা, সাহিত্য, কলারই সমপরিমাণ, কোথাও কোথাও আবার তার চেয়েও বেশি, যে দেশে ধর্মের নামে মানুষ জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়, সেখানে জাতিসত্তা বিষয়ক আলোচনার সময়, ধর্ম সম্বন্ধে চোখ বুজে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। কুর্দিস্তানের কুর্দ জাতি এবং ইরানের শিয়া, উভয়েরই ব্যবহারিক জীবনের ভাষা ফার্সি। কিন্তু নিজেদের স্বতন্ত্র জাতির স্বীকৃতির জন্য কুর্দরা দীর্ঘকাল ধরে

ইরানিদের বিরুদ্ধেই সংঘর্ষ চালিয়ে আসছে। ক্রোয়েশিয়া এবং সার্বিয়ার ভাষার মধ্যে পার্থক্য ততটুকুই যতটা আমাদের দেশে ছাপড়া আর হাজিপুরের মধ্যে। কিন্তু ধর্মীয় কারণে এই দুই জাতি বহুকাল থেকে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। ক্রোয়েশিয়ানরা রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান আর সার্বিয়ানরা অন্যান্য স্লাভ জাতির মতো প্রাচীন গ্রিক চার্চ অনুসরণকারী খ্রিস্টান। যখন ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো জাতি, তার জাতীয়তা বোধের উপরে পৃথক ব্যক্তিত্ব কায়েম করে এবং তার জন্য দৃঢ় অবস্থানও গ্রহণ করে, তখন অতীতে ওই ধর্ম ছিল না অথবা ভবিষ্যতেও ওই ধর্ম থাকবে না এইসব কথা বলে ওই অবস্থানের দিকে চোখ বুজে থাকাও চলে না। তাকে অস্বীকারও করা চলে না। কারণ সমাজের কোনো অংশের নীরবতা, তাদের সেই ধর্মীয় ভাবাবেগের দৃঢ় অবস্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। এই অবস্থায় বিষয়টির মধ্যে না প্রবেশ করলে কোনো সুষ্ঠু সমাধানও পাওয়া যাবে না।

আমাদের একথা স্বীকার করতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয় যে আমাদের দেশের মুসলমান সমাজ জাতীয়তার প্রশ্নে তাদের ধর্মকে বড়ো একটা স্থান দেয়।

ভৌগোলিক অবস্থানও জাতীয় পরিচয়ের একটা কারণ হতে পারে, এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই।

সংক্ষেপে, সংগীত, খাদ্যাভ্যাস এবং বেশভূষা, এগুলিকে গৌণ বিষয় ধরে নিয়ে জাতীয়তার প্রশ্নে সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু জাতি সমস্যা আলোচনা কালে ভাষা, ধর্ম, ভৌগোলিক অবস্থান এই তিনটি বিষয়কে আমরা কোনো অবস্থাতেই বাদ দিতে পারি না। একথাও মনে রাখা দরকার যে ধর্ম এক হলেও ভাষার ভিন্নতার কারণে পৃথক জাতিসত্তার আন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি পাকিস্তানের দাবি স্বীকৃতি পায়, তাহলেও সমস্ত পাকিস্তান এক জাতিভুক্ত হবে না। ভাষার প্রশ্ন সেখানে তীব্র হয়ে দেখা দেবে। আফগানিস্তানের পাঠান শাসকেরা আজ পর্যন্ত সেখানকার সমস্ত সরকারি কাজকর্মে, শিক্ষা ব্যবস্থায়, ফার্সি ভাষা ব্যবহার করে আসছিল। কিন্তু এখন সেখানে স্থানীয় ভাষা পশতোর দাবি জোর গলায় উঠছে এবং সেখানকার সরকারও ওই দাবিকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারছে না, ফলে ফার্সি ভাষা তার গুরুত্ব হারাতে আরম্ভ করেছে। আফগানিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে পাঠানদের পরেই তাজিকদের স্থান এবং তাদের মাতৃভাষা ফার্সি। আমাদের দেশেও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে স্কুল কলেজে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হয়েছে পশতো। আমার তো মনে হয় না যে এই প্রদেশের পাঠানেরা তাদের মাতৃভাষা পশতোকে ত্যাগ করে উর্দুকে তাদের জাতীয় ভাষা বলে মেনে নেবে। পূর্ববঙ্গ—যা পাকিস্তানের আরেকটি অংশ হবে—তারা তাদের সমুন্নত মাতৃভাষা ত্যাগ করে উর্দুকে আশ্রয় করবে, এরকম আশা না করাই শ্রেয়। পাঞ্জাবে পাঞ্জাবি ভাষার প্রশ্ন আছে এবং সিন্ধুপ্রদেশ ও কাশ্মীরেও সময়ের প্রভাবে একদিন এই মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার দাবি জোর গলায় ধ্বনিত হবে। এইভাবে দেখলে, পাকিস্তানও কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার

সম্মিলিত সংঘ হবে, এক জাতির দেশ কখনোই হবে না।

(২) জাতি সমূহের উৎপত্তি—বর্তমানে জাতি সমস্যা বিষয়ে আলোচনা কালে আমরা ধর্মকে উপেক্ষা করতে পারি না, একথা বলার পরও আমাদের বিভিন্ন ভাষার জাতি গোষ্ঠির কাছে যেতে হবে। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে সামান্য কিছু উদাহরণ দিয়েছি। বস্তুত জাতীয়তা প্রধানত নির্ভর করে ভাষার উপরে। অতএব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা কালে আমাদের ভাষার উৎপত্তির ইতিহাসে যেতে হবে এবং আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় জাতির উৎপত্তি, সেখান থেকে সরে না গিয়েও, ভাষা বিষয়ক ইতিহাসের গভীরে যেতে হবে। আমরা উত্তর ভারতের যে কোনো একটি ভাষা ব্রজ, অবধি কিংবা মগহিকে ধরতে পারি। এই ভাষায় যারা কথাবার্তা বলে, তাদের পক্ষে এটা জরুরি নয় যে এই ভাষার জন্মের মতো এই ভাষা ব্যবহারকারীরা সকলে ইন্দো-আর্য জাতির বংশধর হবে। ব্রজ অঞ্চলে বেদের যুগেরও (খ্রিঃ পূঃ ১৫০০) আগে কোনো আর্য জনগোষ্ঠি এসেছিল। যেহেতু তারা ছিল আর্য সেজন্য তাদের ভাষাও কোনো আর্যভাষা ছিল। অন্যদিকে সেই অঞ্চলে প্রভূত সংখ্যায় এমন লোকেরও বাস ছিল যারা আর্য ছিল না এবং তাদের ভাষাও আর্যভাষা ছিল না। শতশত বছর পাশাপাশি বসবাস করতে করতে উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংমিশ্রণ আরম্ভ হয় এবং আর্য জনগোষ্ঠীর ভাষাই আর্য এবং যারা আর্য নয়, এই উভয় গোষ্ঠীরই মাতৃভাষা হয়ে ওঠে ও প্রাক আর্য ভাষাটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও তার কায়া পরিবর্তন করে। এর প্রমাণ আমরা বৈদিক, সৌরসেনি (ব্রজ), প্রাকৃত এবং বর্তমান সময়ের ব্রজভাষার মধ্যে যদি তুলনা করি তাহলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এখন আমাদের প্রাচীন কোনো জনপদেই যেমন বিশুদ্ধ আর্য নেই, সকলেই সংকর জাতি, তেমনই কোনো ভাষাও আর বিশুদ্ধ আর্যভাষা নেই। সেখানেও বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলী নিয়ে জন্ম নিয়েছে এক নতুন ভাষা।

এই সব প্রাচীন জনপদের ভাষার দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এই কারণে যে, কোনো কারণবশত খড়িবুলির মতো কুরু জনপদের (মিরাট কমিশনারি এবং আলিগড় জেলা বাদে) একটি ভাষা এখন সমগ্র উত্তর ভারতের শিক্ষার মাধ্যম হয়ে গিয়েছে এবং তাকে আমরা আমাদের মাতৃভাষার স্থানে অভিষিক্ত করতে চাইছি—অর্থাৎ ব্রজ, বুন্দেলি, অবধি, বারাণসী, ভোজপুরি, মৈথিলি, মগহি, মাড়োয়াড়ি, মেবারি, মালবি, ছত্তিশগড়ি ভাষাকে তাদের বিভিন্ন জনজাতির মাতৃভাষার স্থান থেকে উচ্ছেদ করতে চাইছি। প্রাকৃত ভাষার যুগেও সৌরসেনি, মগহি ইত্যাদি ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল আর এখন তার বিপরীতটাই করতে চলেছি। এটা উচিতও হবে না এবং সম্ভবও নয়। এই সব স্থানীয় ভাষার শিকড়, আমরা যা ভাবি, তার চেয়ে অনেক গভীরে প্রোথিত।

বুদ্ধের সময়েরও আগে ছিল জনপদের যুগ। তখন প্রতিটি জনপদের (কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, কাশী, মগধ) বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য তার ভাষার উপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল যার ফলে এই ভাষাগুলির স্বতন্ত্র এক রাজনৈতিক সত্তাও ছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন

রাজন্যবর্গের মধ্যে যুদ্ধের ফলে এইসব জনপদের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু ভাষার প্রশ্নটি সে যুগেও এত মুখর ছিল যে দুই জনপদ মিলিয়ে এক সম্মিলিত জাতি সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। কাশী জনপদ কোশলের কাছে পরাজিত হয়ে তার স্বাধীনতা হারায়। কিন্তু কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে কাশীবাসীদের ভাবাবেগ ও জাত্যভিমানের কথা মনে রেখে সেখানে নিজের ছোটো ভাইকে কাশীরাজ পদে অধিষ্ঠিত করতে হয়। এই সমস্ত জনপদগুলির জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যের কারণেই ওগুলিকে একত্রিত করে রাতারাতি কোনো এক জাতিভুক্ত সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায়নি। মৌখারি বংশের শাসন (৬০০ খ্রিঃ) কাল থেকে জয়চন্দের গহড়ওয়াড় বংশের শাসন পর্যন্ত (১২০০ খ্রিঃ) এই ছশো বছর ধরে যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাজধানী ছিল কনৌজ। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে ওখানকার শাসকেরা অনেক প্রাচীন জনপদকে ভেঙে কনৌজিয়া নামে নতুন এক জাতিতে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল যে কনৌজের অধিকারভুক্ত অঞ্চলে যারা বাস করে, তারা সকলেই কনৌজিয়া জাতির মানুষ রূপে ঘোষিত হোক এবং সেই মর্মে জাত্যভিমানও প্রকাশ করুক। তাদের আশা আংশিক ফলবতী হয়েছিল। এই কারণেই আজকাল ব্রাহ্মণ, আহির, কান্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষকে কনৌজিয়া বলে অভিমান প্রকাশ করতে দেখি, কিন্তু এগুলি কোনো রাষ্ট্রীয় জাতি নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, প্রাচীর ঘেরা এক সমাজ মাত্র।

ইওরোপের জাতি সমস্যা

ভারতীয় জাতির উদ্ভব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমি বলেছি যে ভাষা এবং তার উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জাতীয় ভাবধারার উদয় হয় সেই সময় থেকে, যখন একই রক্তের ধারক বাহক কোনো গোষ্ঠি বা সম্প্রদায় কোনো বিশেষ একটি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ইওরোপে এরকম গোষ্ঠি বা দল (স্লাভ, জার্মান ইত্যাদি) পৃথক পৃথক পরিবার রূপে বিভিন্ন জায়গাতে বসবাস আরম্ভ করে। পরবর্তীকালে এই পরিবারগুলির মধ্যে সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। দীর্ঘকাল ধরে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এর ফলে বেশ কিছু প্রাচীন ভাষা যেমন লোপ পায়, আবার তেমনই কিছু নতুন ভাষাও সৃষ্টি হয়। জার্মানির পূর্ব প্রান্ত প্রুশিয়ার লোক আগে ছিল স্লাভ, পরবর্তী পর্যায়ে জার্মান জাতির সঙ্গে মিশ্রণ এবং তাদের সংস্কৃতির প্রভাবে স্লাভেরা জার্মান ভাষাকে নিজেদের ভাষা বলে গ্রহণ করে। ইদানীং কালে হিটলারের মতো কট্টর স্লাভ জাতি বিরোধীও কিন্তু সেই মিশ্র জার্মান-স্লাভদের বিশুদ্ধ আর্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে। যেভাবেই হোক একটা ভাষা জনগোষ্ঠিতে স্বীকৃত হয়ে যাবার পর কোথাও ইতিহাসের অতীতের পৃষ্ঠা ওলটাবার প্রয়োজন হয়নি। আধুনিক যুগে আমরা যে ধরনের জাতীয়তাবাদ প্রাচ্য দেশে এবং ইওরোপে দেখছি, তার ইতিহাস কিন্তু খুব পুরানো নয়।

(১) ইওরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব—ভারতবর্ষে সামন্তবাদী যুগে রাজবংশের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের মাধ্যমে জাতি ঐক্যবদ্ধ হত। ইওরোপেও এই একই অবস্থা ছিল।

বস্তুত সামন্তবাদী যুগে জনগণের কোনো স্বীকৃতি ছিল না, রাজা এবং তার কৃপাপাত্র পুরোহিতরাই ছিল সবকিছু—এই পুরোহিত পদেও বড়ো বড়ো মোহান্ত, রাজা এবং সামন্ত পরিবারের লোকজনেরাই নিযুক্ত হত। ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপের বণিকেরা উন্নত নৌ-যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে সারা বিশ্বের সমুদ্র তোলপাড় করা আরম্ভ করল এবং যার ফলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অঞ্চল থেকে অর্থ-সম্পদ এসে তাদের কাছে সঞ্চিত হতে থাকল। সেই অবস্থায় সামন্তশাহির কৃপার আশায় চিরকাল করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বণিককুলের মনের মধ্যেও নিজেদের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস জন্মাতে থাকল। এতকাল বণিকদের দেশ শাসনের যোগ্য মনে করা হত না, কিন্তু এই বণিকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা শক্তিমান জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের পরাজিত করে। নিজেদের আরোপিত শর্তে বাণিজ্য শুরু করে এবং সেই সঙ্গে বহু জায়গাতে দেশ শাসনের ভারও নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে প্রমাণ করেছিল যে সামন্তরা ছাড়া অন্য কোনো শ্রেণিও দেশ শাসনে সক্ষম।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে এক বানিয়া করণিক কলমের পরিবর্তে হাতে তরবারি তুলে নেয় এবং অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করে। ইওরোপের অন্যান্য দেশ—ফ্রান্স, হল্যান্ড, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের বণিকেরাও সংঘ (কোম্পানি) গড়ে ইংরেজ বণিকদের মতোই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশও কায়েম করে। এরকম অবস্থায় অর্থ সম্পদে বলীয়ান বণিকেরা নিজেদের দেশের শাসনভার পরিচালনায় অংশীদার হতে চাইবে না, এমনটা হওয়া সম্ভব ছিল না।

পলাশির যুদ্ধের তিন বছর পর—১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ইওরোপে এক নবযুগের সূচনা হয়, যাকে বলা হয় পুঁজিবাদ। এই যুগে বণিকেরা দেশের কারিগরদের দ্বারা তৈরি জিনিস অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রির কাজই শুধু করত না, তারা উন্নত যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের সুযোগ নিয়ে কলকারখানা খুলতে আরম্ভ করল এবং সেখানে অল্প সময়ে উৎপাদিত প্রচুর পণ্য দিয়ে বিশ্বের সমস্ত বাজার ভরিয়ে তুলল। দেখতে দেখতে বণিক সমাজ শক্তিশালী পুঁজিপতি গোষ্ঠীতে পরিণত হল এবং ক্ষমতানুযায়ী শাসনকার্যে ভাগীদারি দাবি করতে লাগল। এই দাবিকে আরও জোরদার করার জন্য সৌভাগ্যবশত ফ্রান্স, রুশো ও ভলতেয়ারের মতো দুজন শক্তিশালী দার্শনিক ও লেখককে পেয়েছিল। রুশো এবং ভলতেয়ার তাঁদের তীব্র জ্বালাময়ী লেখার মধ্য দিয়ে দেশে সামন্ত শাসনের অবসান এবং জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি তুলছিলেন। ফ্রান্সের জনসাধারণের মনে রুশো এবং ভলতেয়ারের সামন্তবাদ-বিরোধী লেখা তুমুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। পুঁজিপতিরা এরকম অবস্থায় 'জনগণের শাসন' কথাটিকে হাতিয়ার করে জনগণের সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায়। ভোলতেয়ার এবং রুশো ১৭৮৮ সালে প্রয়াত হন, কিন্তু তাঁদের প্রতিবাদী লেখা বিফল হয়নি। ১৭৯০ সালে সারা বিশ্বকে চমকিত করে সংঘটিত হয় ফরাসি বিপ্লব। সেই বিপ্লবে ফরাসি রাজতন্ত্র—বুঁরবো বংশের—পতন হয় এবং সেই বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গে

ইওরোপের সমস্ত দেশের রাজসিংহাসনই দুলে ওঠে।

ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে 'জনগণের শাসন' এই ধ্বনি যেমন প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনই আধুনিক জাতীয়তাবাদের জন্মও হয় সেখান থেকে।

(২) মধ্য ইওরোপে জাতীয়তাবাদের ঢেউ—প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য জার্মানরা ধ্বংস করেছিল এবং সেজন্য পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে নিজেদের গণ্য করত। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ রাজবংশ এই কারণেই প্রায় হাজার বছর ধরে ইওরোপীয় জনমানসে এক বিশেষ সম্মানের স্থান দখল করেছিল। হ্যাপসবুর্গ বংশের কোনো পূর্বজদের হাতেই রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল। হ্যাপসবুর্গ রাজবংশও নিজেদের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পরম্পরার অন্তর্গত বলে দাবি করত। তবে হ্যাপসবুর্গদের একটা অসুবিধা প্রায়শই পোহাতে হত। একদিকে পরস্পর যুদ্ধরত, স্বতন্ত্র প্রায় দুই ডজনেরও বেশি জার্মান রাজ্যের সে ছিল নামমাত্র সর্দার, অন্য দিকে চেকোশ্লোভাকিয়া, ম্যাগিয়ার (হাঙ্গেরিয়ান), রুথেনিয়া, রুমানিয়ান, সার্বিয়ান, ক্রোয়েশিয়ান ইত্যাদি অজার্মান জাতি অধ্যুষিত বিশাল এক অঞ্চলের সে ছিল প্রকৃত শাসক। এই শাসিত জাতির মধ্যে জার্মান জাতিভুক্ত অস্ট্রিয়ানদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। একভাবে দেখলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য অ-জার্মান জাতি গোষ্ঠির বাইরে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইওরোপে যখন জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি খুব বড়ো হয়ে দেখা দিল তখন অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের সামনে প্রশ্ন এল যে সে কী সমস্ত জার্মান জাতিগোষ্ঠীর নামমাত্র সর্দার হয়ে থাকবে নাকি সে সমস্ত জার্মান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনবে এবং তার মাধ্যমে অজার্মান বিশাল জাতিকে শাসন এবং শোষণ করবে। জার্মান জাতিগুলির মধ্যে প্রুশিয়া, ব্যাভেরিয়াও ছিল যাদের শক্তি সামর্থ্যকে হ্যাপসবুর্গ বংশ ভয় পেত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অস্ট্রিয়ায় হ্যাপসবুর্গ রাজবংশ মেটারনিকের মতো একজন বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞকে পেয়ে যায়। হ্যাপসবুর্গ বংশের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হচ্ছিল অ-জার্মান জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করতে। মেটারনিক যা পারেনি, তাকেই সফল করে দেখায় প্রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্ক। বিসমার্ক প্রুশিয়াকে এক শক্তিশালী রাজ্যরূপে সংগঠিত করে এবং জার্মান জাতীয়তাবাদের ধ্বনি তুলে অস্ট্রিয়া বাদে, অন্যান্য জার্মান সর্দারদের দ্বারা শাসিত অঞ্চলকে একত্রিত করে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে সেডনের রণক্ষেত্রে ফ্রান্সকে ভীষণ ভাবে পরাজিত করে। সমগ্র জার্মানজাতির একীকরণ সম্পূর্ণ হয় এবং তাদের প্রধান হিসেবে প্রুশিয়া নিজেকে মেলে ধরে এবং ইওরোপের মানচিত্রে নিজের পরিচয় সুদৃঢ় করে। এর কিছুকাল পরেই অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ বংশকে সরিয়ে প্রুশিয়া সমস্ত জার্মান জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের কর্ণধার হয়ে বসে এবং প্রুশিয়ার সম্রাটের উপাধি হয় কাইজার। তিনপুরুষ এই বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। ১৯৩৩ সালে হিটলারের আগমনের আগে পর্যন্ত জার্মান রাষ্ট্রে একটি মাত্র জাতীয় শাসন ছিল না। কাইজারের আমলেও বাইশজন স্বতন্ত্র মুকুটধারী রাজা জার্মান অঞ্চলে ছিল। হিটলার ক্ষমতায় এসে সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে

বিনাশ করে এবং সে নিজে এক সার্বভৌম জার্মান জাতি ও রাষ্ট্রের হর্তা, কর্তা, বিধাতা হয়ে বসে। হিটলার জার্মান জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক শাসনকে উচ্ছেদ করেই ক্ষান্ত হয়নি। এরপর সে সমস্ত বিশ্বের উপরেই আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতে থাকে। আজ একথা স্পষ্ট হিটলারের ওরকম উত্থানের পিছনে জার্মান জাতীয়তাবাদের ভূমিকাও বড়ো কম ছিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা কীরকম ছিল? ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ ফরাসি দেশকে প্লাবিত করে পৌঁছেছিল পূর্ব ইওরোপের অ-জার্মান জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে। রাজনৈতিকভাবে ওই অঞ্চল ছিল পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীন। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অ-জার্মান জাতিগুলির মধ্যে হাঙ্গেরির ম্যাগিয়ারেরা ছিল সবচেয়ে সাহসী এবং সংগ্রামী। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ে। লুই কোসুথ (১৮০২-১৮৯৪) ছিল এই জাতীয়তাবাদ সঞ্চারের অগ্রণী নেতা। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনীতে সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য এই ম্যাগিয়ারদের বিশেষ চাহিদা ছিল এবং সৈন্য সংগ্রহের কাজটা হ্যাপসবুর্গ রাজবংশ (পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য) ম্যাগিয়ার সামন্তদের দিয়ে করাত। ম্যাগিয়ার সামন্তরা ছিল বিশেষভাবে রাজভক্ত। কোসুথ ম্যাগিয়ারদের উপরে অস্ট্রিয়ার এই নিরঙ্কুশ শাসনের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকল। কোসুথ তাঁর লেখনী ও বাগ্মীতা উভয়ের সাহায্যে এই বিরোধিতাকে আন্দোলনের রূপ দেন। ম্যাগিয়ার জাতির স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন দাবানলের মতো হাঙ্গেরি এবং তার বাইরে অস্ট্রিয়ার প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। কোসুথের তিন বছরের কারাদণ্ড হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কোসুথ কারাগার থেকে মুক্তি পান। কোসুথ কারান্তরালে থাকার সময়েও ম্যাগিয়ারদের জাতীয় আন্দোলন থেমে থাকেনি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছিল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কোসুথ তাঁর এক লেখায় অস্ট্রিয়ান শাসন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। কোসুথের এই লেখাটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার দশ দিনের মধ্যে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ছাত্র ও শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করে এবং রাজপথে ব্যারিকেড তৈরি করে সামরিক বাহিনীর মোকাবিলা করে। অবশেষে অস্ট্রিয়ার নিরঙ্কুশ শাসক গোষ্ঠী হাঙ্গেরির দাবি মানতে বাধ্য হয়।

কোসুথের নেতৃত্বে পরিচালিত এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সমস্ত জাতিগুলিরই প্রবল সমর্থন ছিল। তারা ম্যাগিয়ারদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতির এই আন্দোলনকে নিজেদের জাতিসত্তার আন্দোলনের পথিকৃৎ মনে করত, সেজন্য ম্যাগিয়ারদের তারা বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখত। তারা আশা করত যে হাঙ্গেরির আন্দোলন জয়যুক্ত হলে তারাও উপকৃত হবে, অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন থেকে নিত্যদিন আর নিগৃহীত হতে হবে না। হাঙ্গেরির ম্যাগিয়াররা যখন অস্ট্রিয়ার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হল, তখন তারা তাদের সহযোদ্ধা জাতিসমূহ— সার্বিয়ান, ক্রোয়েশিয়ান, রুমানিয়ান ইত্যাদিদের সেই অধিকার দিতে অস্বীকার করল। যে

অধিকারের জন্য একদিন ম্যাগিয়ারেরা ওই সমস্ত জাতির সঙ্গে মিলিতভাবে অস্ট্রিয়ার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। ভিয়েনা সরকারের কাছে নিজেদের জাতির জন্য যে সমস্ত অধিকার দাবি করে ম্যাগিয়ারেরা দাবিপত্র পেশ করেছিল, অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে সেই সব অধিকার আদায় করার পর ম্যাগিয়ারেরা তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায় এবং একদা তাদের সহযোদ্ধা এবং বর্তমানে অধীন জাতিগুলির অধিকারকে অস্বীকার করল। অন্যান্য জাতিগুলি কিন্তু ম্যাগিয়ারদের কাছে জাতীয় স্বাধীনতার দাবি তোলেনি। তারা চেয়েছিল নিজেদের অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন এবং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সরকারি স্বীকৃতি। ম্যাগিয়ারেরা এই সমস্ত দাবির একটিও পূরণ করতে অস্বীকার করে এবং ঘোষণা করে যে হাঙ্গেরিতে একটি মাত্র জাতিই বাস করবে। ম্যাগিয়ারেরা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক নাগরিককে সমানাধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ম্যাগিয়ার ছাড়া অন্য কোনো ভাষা এবং সংস্কৃতিকে স্বীকৃতি দেয়ার তীব্র বিরোধী ছিল। ম্যাগিয়ারেরা এরপর অন্যান্য জাতিগুলিকে ম্যাগিয়ারকরণের জন্য উঠে পড়ে লাগে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত সর্বত্রই একমাত্র ম্যাগিয়ার ভাষাকেই মান্যতা দেয়া হয়। আমেরিকান ঐতিহাসিক C. D. Hazen তাঁর *Modern European History*, 1937 পুস্তকের 302-303 পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

'The Magyars, though a minority of the whole people, had always been dominant But the national feeling was strong and growing with Serbs, Croatians and Rumanians. These, in the summer of 1848, demanded of the Hungarian Diet much the same privileges which the Magyars had won for themselves from the Vienna Government. They wished local self-government and the recognition of their own language and peculiar customs. To this the Magyars would not for a moment consent. They intended that there should be one nationality in Hungary—that of the Magyars. Individual civil equality should be granted to all the inhabitants of the kingdom of whatever race, but no separate or partly separate nations and no other official language that their own as a consequence, the bitterest race hatreds broke out

'The Magyars would not grant to others the fundamental right which they had long so stoutly asserted for themselves They began indeed, forthwith a policy of oppression, a policy of Magyarisation, of compressing all these various peoples into one common mould, of forcible assimilation

'The Magyars insisted that the Magyar language should be taught in all the schools of Croatia and should be used in all official communications between that province and the Central Government in Budapest.'

হাঙ্গেরির রাষ্ট্রনেতাদের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের দেশের জাতীয় নেতাদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গির এক অদ্ভুত মিল লক্ষ করা যায়। আমাদের নেতৃত্বও সংখ্যালঘু

জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে ম্যাগিয়ার নেতৃত্বের মতোই কঠোর, যদিও তাঁরা নিজেদের জন্য এই দাবি নিয়ে বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে সংগ্রাম করে আসছেন।

(৩) পূর্ব ইওরোপে জাতীয়তাবাদের ঢেউ—তুরস্কে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তুরস্কের সুলতান দেশে পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে সম্মত হন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সার্বিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে তুরস্কের সুলতানের শাসন বলবৎ ছিল। ইওরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ থেকে তুরস্কও মুক্ত থাকেনি। সুলতানি শাসনব্যবস্থা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের উপরে অনেক অত্যাচার করেছে। নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, তাদের অনেককে দেশের বাইরে নির্বাসিত করেছে, কিন্তু আন্দোলন দমিত হয়নি।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে তরুণ তুর্কিরা বিনা রক্তপাতে যে বিপ্লব সংঘটিত করে, তার প্রভাব অনিবার্যভাবেই তুরস্কের শাসনাধীন সমস্ত অঞ্চলেই পড়েছিল। তুরস্কের অধীন অন্যান্য জাতি—খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী গ্রিক, সার্বিয়ান, বুলগেরিয়ান, আর্মেনিয়ান, ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরব, আলবেনিয়ান, তুর্কি ইত্যাদিরাও তুরস্কের বিপ্লবকে স্বাগত জানায়। বিপ্লব পরবর্তীকালে মনে হয়েছিল যে এবার তুরস্কের সমস্ত অঞ্চলে ধর্মীয় এবং জাতীয় বৈষম্য সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পাবে। এই আশা নিয়েই অন্যান্য জাতিরাও তুরস্কের বিপ্লবকে সমর্থন করে এক ভ্রাতৃভাবের প্রদর্শন করেছিল।

['This revolution ... was received with incredible enthusiasm throughout the entire breadth of the Sultan's dominions. Mohammedans & Christians, Greeks, Serbs, Bulgarians, Albanians, Armenians, Turks all joined in jubilant celebration of the release from intolerable condition. The most astonishing feature was the complete subsidence of the racial & religious hatreds which had hitherto torn & ravaged the Empire from end to end. The revolution proved to be the most fraternal movement in modern history ' *Modern European History,* pp. 556-7. 'The very atmosphere was charged with the hope & the expectation that the reign of liberty, equality, & fraternity was about to begin...' pp. 594-7]

এবার তুর্কিদের প্রমাণ করার সময় এল যে তারা যে সমস্ত নীতি নিয়ে তুরস্কে বিপ্লব করেছিল, সেই নীতির সুফল তুরস্কে শাসনাধীন অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিরাও পাবে। কিন্তু অবাক করার বিষয়, ম্যাগিয়ারদের মতো তারাও প্রথম থেকেই এই সব প্রতিশ্রুতি থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের নীতি গ্রহণের পরিবর্তে এক তুর্ক জাতির স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রবর্তন করে এবং জনগণের অধিকারকে নির্মমভাবে দমন করে। তুরস্কে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কিরা যেনতেনপ্রকারেণ সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের জাতির হাতে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়াস চালাতে থাকে। সেখানকার পার্লামেন্টের নির্বাচনে এমন ধরনের কারচুপি করে যে সমস্ত অ-তুর্কি জাতি একত্রিত হয়েও ইসলামি তুর্কিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে

খর্ব করতে পারেনি। তুর্কিরা গ্রিক, আর্মেনিয়ান ও আরবদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার করতে চায়নি। ম্যাগিয়ারদের মতো তাদেরও ছিল একটা নীতি—সকলকে তুর্কি বানাও, আদন শহরে তিরিশ হাজার আর্মেনিয়ান খ্রিস্টানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কিন্তু তুর্কি সরকার সেই অপরাধের হোতাদের দণ্ড দেবার কোনো চেষ্টাই করেনি। তুরস্কের অ-মুসলমানেরা এ যাবৎকাল যে সমস্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল, এবার তারা সেগুলিকেও কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে আরম্ভ করল। যে সমস্ত সংঘ্যালঘু জাতি ব্যাবসা-বাণিজ্যে দক্ষ ছিল, তাদের সঙ্গে লেনদেন বয়কট করে এবং আরও নানা বৈধ ও অবৈধ উপায় অবলম্বন করে তাদের ব্যাবসা বন্ধ করতে বাধ্য করে। ম্যাসিডোনিয়ায় ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছিল সংখ্যালঘু, তারা যাতে অচিরেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারে সেজন্য অন্যান্য জায়গা থেকে মুসলমানদের এনে ম্যাসিডোনিয়ায় বসবাসের ব্যবস্থা করে।

'From the very beginning they failed ... Instead of seeking to apply the principles of liberty, equality and fraternity, they restored the autocratic government, to domination of a single race, to the ruthless suppression of the rights of the people In the very first election to Parliament they arranged affairs so that they would have a majority over all other races combined. They did not intend to divide power with the Christian, Greeks & Armenians or the Mohammedan Arabs. Their policy was one of Turkification they made no attempt to punish the perpetrators of the Adana massacres in which over thirty thousand Armenian Christians were slaughterd They intended to suppress by force all religious privileges They also alarmed & embittered by a commercial boycott They sought to reinforce the Moslem elements of the population by bringing in Moslems from other regions...' *Modern European History,* p.598

হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণে যদি ভারতীয় মুসলমানেরা শঙ্কাবোধ করে, তাহলে উপরোক্ত উদাহরণ দেখে তাদের সেই শঙ্কাকে অমূলক বলা চলে না। বিশেষ করে পুঁজিপতি এবং তাদের পেটোয়া মধ্যবিত্তের দল যতদিন পর্যন্ত শাসনযন্ত্র কব্জা করে থাকবে ততদিন পর্যন্ত এদের কাছ থেকে তুর্কি কিংবা ম্যাগিয়ারদের চেয়ে ভালো কিছু আশা করাই হবে ভুল।

জাতিসত্তার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রয়োজন

(১) শোষণ রোধ করা—স্বাধীনতার সংজ্ঞাকে পুঁজিবাদী রাজনীতিবিদেরা সারা পৃথিবী জুড়েই নানা কথার ধূম্রজালে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ শোষণের স্বাধীনতা। ভারতীয় পুঁজিপতিরা কোনো এক সময়ে রাজনীতি, বিশেষ করে কংগ্রেসের চরমপন্থী রাজনীতিকে ভয় পেত, কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল কংগ্রেস যে ধরনের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে তাতে তাদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা তো নেই-ই বরং সবটাই শুধু লাভ। তখন থেকে তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের

প্রতি সহানুভূতি দেখাতে আরম্ভ করে। আর এখন তো কংগ্রেস নেতৃত্বের লাগামই তাদের হাতে। ঠিক এমন ভাবেই ইংলন্ড আমেরিকাতেও সরকারের দণ্ডমুণ্ডের মালিক ওখানকার বড়ো বড়ো পুঁজিপতিরা। স্বাধীনতা আন্দোলন ভারতীয় পুঁজিপতিদের উদ্যোগ-ধান্ধাকে কী পরিমাণে ফুলে ফেঁপে উঠতে সাহায্য করেছে তার উদাহরণ যুদ্ধপূর্বকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় পুঁজির বৃদ্ধির একটা পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে। ভারতীয় পুঁজিপতিদের বড়ো অংশই হিন্দু। কে বলতে পারে যে অখণ্ড ভারতের আওয়াজ তোলা হিন্দু পুঁজিপতি এবং তাদের তাঁবেদার রাজনীতিবিজ্ঞদের মনে এমন ভাবনা কাজ করছে না, যাতে তারা ভারতের মুসলমান প্রধান অঞ্চলেও ব্যাবসাবাণিজ্য দখল করে কিংবা বিস্তার করে শোষণের সাম্রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করতে পারে। পাকিস্তানের দাবি তোলা মুসলমান নেতাদের মনেও তাদের এলাকায় আর্থিক শোষণ চালাবার একচেটিয়া অধিকার পাওয়ার লালসা যে কাজ করছে তাকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু শুধু এই কারণের জন্যই মুসলমান প্রধান অঞ্চলে হিন্দু পুঁজিপতিদের অবাধে লুঠপাট চালাবার খোলাছুট দেয়া হোক, এটাও কোনো যুক্তি হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি পাকিস্তানপন্থী এবং তার বিরোধীদের মনোভাব বিশ্লেষণ করি তাহলে বোঝা যাবে যে উভয় পক্ষের দাবির পিছনেই শোষণের মানসিকতাই কাজ করছে। শোষণের চিরন্তন অবসানের জন্য যে বিপ্লব সংঘটিত করা প্রয়োজন, সেই বিপ্লবের স্বার্থেই আমাদের জাতিগুলির স্বতন্ত্র অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া প্রয়োজন। এটাই আমাদের বক্তব্যের প্রধান বিষয়।

(২) প্রগতির পথের বাধা অপসারণ—মুসলমান পুঁজিপতিরা ভাবছে নিজেরা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকারভুক্ত অঞ্চলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্যের ইজারাদারি কায়েম হোক যাতে সেই অঞ্চলে নতুন করে যেন কোনো পুঁজিপতি ঢুকতে না পারে। মুসলমান পুঁজিপতিদের প্রধান লক্ষ্য তাদের প্রাধান্যের এলাকায় আধডজনের মতো বড়ো হিন্দু পুঁজিপতি পরিবার, যারা বড়ো বড়ো অছি পরিষদের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে আছে। এই অছি পরিষদ গঠন করে ব্যাবসা চালাবার পাঠ হিন্দু পুঁজিপতিরা ইংলন্ড আমেরিকার পুঁজিপতিদের কাছ থেকে নিয়েছে। এই সমস্ত পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্ক এবং বিমা ক্ষেত্রে লগ্নী করে সমস্ত ব্যাবসাকেই প্রায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে। যার ফলে সমস্ত প্রধান শিল্পোদ্যোগের— বস্ত্র, চিনি, কাগজ, পাট, তেল—এরাই মালিক। শুধুমাত্র ন্যায় বিচারের দোহাই দিয়ে অল্প পুঁজি নিয়ে ব্যাবসাতে নেমে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা সম্ভব নয়। জলাশয়ে ছোটো মাছকে বড়ো মাছ গিলে খায়, এই মাৎস্যন্যায়নীতি ব্যাবসাবাণিজ্যের জগতেও বহুল প্রচলিত। বস্তুত এর ফলে বড়ো পুঁজিপতিরাই বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থিক উন্নতি ঘটানোর দায়িত্ব পায়। কারণ যতক্ষণ এরা তাদের পুঁজি নিয়ে মাঠে না নামছে, ততক্ষণ নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়, কারণ অন্যরা যদি আসরে নামেও তাহলেও এই বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের অসম প্রতিযোগিতার মুখে ফেলে তাদের শিল্পোদ্যোগকে ধ্বংস করে দেবে। যে সমস্ত প্রদেশে, সংখ্যাগুরু অংশ

এই ভয়ে ভীত, সেখানে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাদের ভাগ্যকে কোনো বিশেষ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না।

(৩) ধার্মিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবনার সংরক্ষণ—রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে ধর্মীয় ভাবনাকে জুড়ে ফেললে কী ভীষণ সমস্যার উদ্ভব হয়, ইওরোপের ইতিহাসে তার প্রমাণ আমরা দেখেছি, আর যতদিন পর্যন্ত ধার্মিক কট্টরতা আমাদের সামাজিক পরিবেশকে কলুষিত এবং অস্থির করে তোলার ক্ষমতা রাখবে ততদিন পর্যন্ত সেদিকে নিশ্চিন্তে চোখ বুজে অখণ্ড ভারতের কীর্তন আলাপ আমরা চালিয়ে যেতে পারি না। একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার যে ধর্ম সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই করে না। ধর্মের নামে প্রতিবছর আমাদের দেশে শতাধিক খুন, জখম, দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোর বিষয়টি শান্ত না হয়ে দিনে দিনে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। আমি একথা অস্বীকার করি না যে এই সমস্ত ধর্মীয় দাঙ্গার পিছনে অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং স্বার্থান্বেষীদের যথেষ্ট সক্রিয় প্ররোচনা থাকে। আমাদের জাতীয় নেতাদের কাছে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা মনে হয় যেন অনেক কঠিন। তার জন্য যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয় তো হোক, এমনই তাদের মনোভাব। শোষণের অবসানের কথা তো অনেক দূরের বিষয়। কৃষক শ্রমিকের কিছুটা পক্ষে যায় এমন দু-একটা ছোটোখাটো আইনি সংস্কারের প্রশ্নেও গেল গেল রব ওঠে। এ বিষয়ে আমাদের প্রাদেশিক সরকারগুলি স্থিতাবস্থা বজায় রাখার দাবি তুলে কীরকম নগ্ন নৃত্যের প্রদর্শন করেছে, আমরা সকলেই তার সাক্ষি। সাম্প্রদায়িক বিভেদের পিছনে যে শোষণ বঞ্চনা ক্রিয়াশীল রয়েছে, তাকে দূর করার জন্য কোনো কর্মসূচি এই জাতীয় নেতৃত্বের কাছে রাখা পণ্ডশ্রম মাত্র। আবার যতদিন পর্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সমাজে থাকবে ততদিন পর্যন্ত পারস্পরিক সন্দেহ বিদ্বেষকে মিষ্টি মিষ্টি বুলি কিংবা মুনি-ঋষি-পির-পয়গম্বরের দোহাই দিয়ে নির্মূল করতে পারব না। বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক জট খোলার জন্য নানক-কবিরের প্রবচনের আশ্রয় নেয়াটা নেহাতই আত্মপ্রবঞ্চনা। সমস্যার মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে এবং এই জটিলতার আপাত সমাধান, যে-যে প্রদেশে যে-যে জাতি সংখ্যাগুরু, তাদের সেখানে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে।

(৪) প্রকৃত বিপ্লবের সহায়ক—ভারতে একটি দুটি নয়, প্রচুর সমস্যা রয়েছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, সামাজিক বৈষম্য, জাতপাতের ভেদ, অস্পৃশ্যতা, বেকারি, সরকারি চাকরিতেও জাতপাতের বিচার, ধর্ম, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত ব্যাধির ওষুধ একটাই, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এমন হতে হবে বা করতে হবে যাতে সরকার তার প্রাথমিক দায়িত্ব হিসাবে, সমস্ত দেশবাসীকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে বাধ্য থাকে, আর এরকম অবস্থা তখনই হতে পারে যখন জনসাধারণের প্রয়োজন ও হিতের লক্ষ্যে কলকারখানা পরিচালিত হবে, শুধু মাত্র মুনাফার স্বার্থে নয়। পুঁজিবাদ দশ-বিশটি পরিবারকে কোটিপতি করতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে অনাহার, অশিক্ষা আর বেকারি থেকে

মুক্তি দিতে পারে না এবং এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বোধ হয় আমাদের আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিলে, একটা সুবিধা এই হবে যে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আমাদের মধ্যে দেখা দেবে না, আর দেখা দিলেও তার মোকাবিলা করা বর্তমান পরিস্থিতির তুলনায় অনেক সহজ হবে। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে সেখানকার শ্রমিক কৃষকের দাবি নিয়ে আন্দোলন যারা করবে, তাদের অধিকাংশই হবে মুসলমান যার ফলে সেখানে হিন্দু জুজুর ভয় দেখিয়ে মুসলমান নেতৃত্বে চলা শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে কোনো সাম্প্রদায়িক ফাটল সেখানকার শোষকেরা ধরাতে পারবে না। 'ইসলাম বিপন্ন' কিংবা 'হিন্দু ধর্ম যায় যায়' এরকম অর্বাচীন আওয়াজ তুলে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হবে।

পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান

আজকাল আমাদের দেশে পাকিস্তান এবং অখণ্ড হিন্দুস্থান এই দুটি প্রশ্ন জনগণের মনে ভীষণ ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তান, হিন্দুস্থানিদের কয়েক শতাব্দী ধরে পালন করে আসা নির্জীব জীবনচর্চারই পরিণতি। কারণ তারা কখনোই সমস্ত হিন্দুস্থানিদের এক জাতিভুক্ত করার কোনো চেষ্টাই করেনি। আজ অনেকে পাকিস্তানের দাবি তোলাকে রাষ্ট্রবিরোধী, বিদেশি শাসকদের দালাল ইত্যাদি বিশেষণে আভুষিত করে প্রশ্নটিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায়। বিষয়টি নিয়ে ঠান্ডা মাথায় আর একটু বিচার বিশ্লেষণ করা যাক।

(১) হিন্দুদের ধর্মান্ধতা—কিছু মানুষ আবার এর জন্য মুসলমানদের ধর্মান্ধতাকেই দায়ী করে। তারা বিশ্বাস করে যে হিন্দুদের মধ্যে কোনো ধর্মান্ধতা নেই। এই যে হিন্দুরা মুসলমানের স্পর্শ করা রুটি, ডাল, এমনকি পান পর্যন্ত খায় না এটাকে ধর্মান্ধতা বলব না তো কি বলব? সাম্প্রতিক কালে দিল্লির এক প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রে এক শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রীষ্মের সময় দিল্লিতে নানা প্রতিষ্ঠান জলসত্র খোলে যাতে পথ চলতি লোকজন পিপাসার্ত হলে সহজেই জলপান করতে পারে। উক্ত মুসলমান ভদ্রলোকও জলপানের জন্য ওরকম একটি সত্রে গিয়েছিলেন। সত্রটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল একজন হিন্দু। সেই 'উদার' হিন্দু পরিচালক মুসলমান ভদ্রলোককে সত্রের বাইরে বাঁশের একটা চোঙা লাগানো আছে সেখানে গিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে জল খেতে উপদেশ দেয়। আত্মসম্মান বোধ আছে এমন যে কোনো ব্যক্তির পক্ষেই ওই অপমান বরদাস্ত করা সম্ভব নয়, ভদ্রলোক জলপান না করেই বেরিয়ে যান। এই ঘটনাকেও যদি কেউ হিন্দু ধর্মের সঙ্কীর্ণতা বলে মানতে অস্বীকার করে, তাহলে বলতে হবে যে সে তার বুদ্ধি-বিবেচনা-বোধ হারিয়েছে।। দিল্লির এই জলসত্রের আদর্শে চালিত অখণ্ড হিন্দুস্থানে এরপর যদি কোনো আত্মসম্মান-বোধ সম্পন্ন মানুষ থাকতে পছন্দ না করে তাহলে তাকে

খুব দোষ দেয়া যায় কি? এরকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘটনাই আজকের পাকিস্তান দাবিকে উসকে দিয়েছে?

অখণ্ড হিন্দুস্থানের জন্য একটি দেশের মতো একটি অখণ্ড জাতিরও প্রয়োজন। পৃথিবীর কোথাও কী এমন দেখা যায় যে এক জাতিভুক্ত মানুষের মধ্যে, আহার-বিহার, বিবাহ সম্বন্ধ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। বিবাহসম্পর্ক মানুষের মধ্যে একজাতি মনোভাব গড়ে তুলতে খুবই সহায়ক। মুসলমানেরা এবিষয়ে উদার হলেও হিন্দুরা এর কট্টর বিরোধী। যখন আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দরাই তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙতে পারল না, তারা এখনও ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ ইত্যাদির গণ্ডি ছাড়াতে পারল না, তখন কি করে আশা করব যে এই সব মহান নেতাদের নেতৃত্বে এক অখণ্ড হিন্দুস্থান এবং তার মধ্যে একটি মাত্র সত্তা বিশিষ্ট এক অখণ্ড জাতি গড়ে উঠবে? পথ চলতে গেলে দেখা যায়, পুরি, মিষ্টি, সোডাওয়াটার, লেমনেড ইত্যাদি দোকানের অধিকাংশেরই মালিকানা হিন্দুদের, সরাসরি অর্থোপার্জনের এটা একটা উপায়। মুসলমানদেরও কিছু কিছু এইধরনের দোকান আছে কিন্তু হিন্দুরা ব্যাপকভাবে সেগুলোকে বয়কট করে চলে এবং নিজেরা এক অলিখিত ঐকমত্যে পৌঁছেছে যে হিন্দুরা শুধু হিন্দুদের দোকান থেকেই জিনিসপত্র কিনবে। অখণ্ড জাতিয়তার ধুয়া তুলে কট্টর হিন্দুরা এহেন সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনা যদি ধর্মান্ধতার উদাহরণ না হয় তাহলে ধর্মান্ধতা কাকে বলে?

(২) ভাষার সমস্যা—ভাষা নিয়ে বিরোধ অর্থাৎ হিন্দি না উর্দু, এই প্রথা বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাব এবং কিছু দেশীয় রাজ্যে বেশ প্রকট। এই বিরোধ দৃঢ় করতে জাতীয় নেতৃত্ব চেষ্টা করছে, তবে কী ভাবে? একটা প্রবাদ আছে যে 'হেলে ধরতে পারে না চলেছে কেউটে ধরতে' জাতীয় নেতারা সেরকমই কিছু করার চেষ্টা করছেন। হিন্দি উর্দুর বিরোধ প্রকৃত পক্ষে সেই দুই সংস্কৃতির বিরোধ। এই দুই ভাষা একই অঞ্চলে দুই ভিন্ন রাস্তায় বিকশিত হয়েছে। বিরোধের সেটও একটা কারণ। কারও কারও বক্তব্য যে হিন্দি উর্দুর ঝগড়া এড়াবার জন্য আমাদের এই দুই ভাষাকেই বাদ দিয়ে হিন্দুস্থানি ভাষা গ্রহণ করা উচিত। অনেকেরই মনে হতে পারে সত্যিই তো, এ তো বড়ো সহজ পথ, নির্ভাবনায় হাঁটা শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে আমরা যত গভীরে যাব তত দেখব যে এই সব জোড়াতালি দেয়া শর্ট-কাট পদ্ধতি আদপেই কোনো কাজের নয়। প্রথমেই দেখতে হবে যে আমরা হিন্দুস্থানি নামে কী কোনো নতুন ভাষাকে সৃষ্টি করতে চাইছি নাকি এই ভাষাটি তার আপনরূপে জনসমাজে প্রচলিত আছে। যদি এটি একটি প্রচলিত ভাষা হয়ও তাহলেও কোন্ মন্ত্রবলে গালিব, ইকবালের ভাষাকে সুর, তুলসী, প্রসাদ, পন্থের ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দেবে। যদিও এই দুই ভাষার মধ্যে বেশ কিছু মিল আছে কিন্তু অমিলের পরিমাণও খুব সামান্য নয়।

কিন্তু এই ভাষার প্রবক্তারা একটিকে অন্যটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য যতই জোর গলায় সওয়াল করুন না কেন, বিপক্ষের কাছে তা গ্রহণীয় মনে হয় না। আমাদের জাতীয়

নেতৃত্ব যদি হিন্দুস্থানি নামে নতুন এক ভাষা সৃষ্টি করার জন্য আদাজল খেয়ে না নামতেন, তাহলে হয়তো হিন্দি উর্দুর ঝগড়া এতটা মাত্রা পেত না। বিহারে এই হিন্দুস্থানি ভাষা গড়ার জন্য যে কমিটি তৈরি হয়েছে তাঁরা অনেক পরিশ্রম করে এই ভাষার জন্য একটি পারিভাষিক শব্দের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এই তালিকা উর্দুভাষীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি, কারণ এর মধ্যে প্রচুর সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ আছে। আবার হিন্দিওয়ালারাও না-খুশ। কারণ এর মধ্যে আরবি-ফারসি শব্দের বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি। বর্তমান সময়ে, বিজ্ঞানের যুগে পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এই পারিভাষিক শব্দের ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে হিন্দুস্থানি ভাষার জাহাজ ভেঙে চৌচির। হিন্দি উর্দু সাহিত্যের প্রবাদ-প্রবচন এবং সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য সম্ভারকে একটু মনযোগ সহকারে দেখলে দেখা যাবে যে এই দুটি আদ্যন্ত স্বতন্ত্র ভাষা, যদিও এই দুই ভাষার মূল এক, কিন্তু এদের বিকাশ দুটো ভিন্ন পথে এতদূর প্রসারিত হয়ে গিয়াছে যে, কোনো ভাবেই এদের আবার মূলের কাছে ফিরেয়ে আনা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দর্শন-সাহিত্যকে ধরতে পারি। হিন্দিবাদীরা তাদের দার্শনিক গ্রন্থে উপনিষদের কাল (৭০০ - ৬০০ খ্রিঃ পূঃ) থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত চলে আসা সংস্কৃত ভাষার বিশাল ভাণ্ডার থেকে অনায়াসে নানা সহায়তা নিতে পারে এবং অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা, যেমন গুজরাটি, মারাঠি, ওড়িয়া, বাংলা ইত্যাদিদেরও সেই সুযোগ আছে। কিন্তু এর বিপরীতে উর্দুভাষীরা তাদের দার্শনিক গ্রন্থে সেইসব আরবি ফারসি শব্দকে গ্রহণ করেছে যে শব্দগুলি ফারাবি, রোশদ ইত্যাদি দার্শনিকদের রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে। উর্দুভাষীরা তার সঙ্গে সেই সমস্ত আধুনিক শব্দকেও ব্যবহার করেছে যেগুলি মিশর সিরিয়া ইরানের আধুনিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এসব দেখে মনে হয় দুজনের কাউকেই তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ত্যাগ করতে বাধ্য করার অর্থ, ভাষার প্রাচীন ঐতিহাসিক বিকাশের তাৎপর্যকে অস্বীকার করা।

হিন্দি এবং উর্দু, স্বতন্ত্র দুটি ভাষা। এই সত্যকে স্বীকার করে নিলে, আমরা কী ভাবে একে অপরের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি, তার পথ খোঁজা সহজ হয়ে যায়। হিন্দুস্থানি নামের কোনো এক কৃত্রিম, আরোপিত ভাষার মাধ্যমে সে কাজ সম্ভব নয়। আজকের যুগে, শ'পাঁচেক পারিভাষিক শব্দের বলে বলীয়ান হয়ে কোনো ভাষা, সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠার দাবি করতে পারে না, হিন্দি উর্দু যেমন স্বতন্ত্র আছে তাদের তেমনই থাকতে দেয়া উচিত।

মুসলমানরা উর্দুর দাবি পেশ করে এবং তাকে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি অ্যাখ্যা দিয়ে, তার কণ্ঠরোধ করা চলে না। যারা একটি ভাষার উপরে আরেকটি ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, কিংবা তাকে বিকৃত করার চেষ্টা করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দেয়।

(৩) জাতিয়তা বিরোধী হাওয়া—অখণ্ড হিন্দুস্থানের অনেক প্রবক্তাকেই বলতে শোনা

যায় এবং তাঁরা গভীরভাবে বিশ্বাসও করেন যে মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব আছে। তাঁদের বিশ্বাসের প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা স্বাধীনতা-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয়া শহিদদের তালিকা উপস্থিত করেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুসলমানদের প্রাণ বিসর্জন দেয়ার ঘটনা হিন্দুদের তুলনায় খুবই কম। জানি না এর দ্বারা কী বোঝাতে চান, তাঁরা কি বলতে চান মুসলমানরা তুলনায় ভীরু, প্রাণের মায়া তাদের বেশি?

কিন্তু যাঁদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে, তাঁরা অন্তত জানেন যে প্রাণ বিসর্জনের প্রশ্নে মুসলমানরা কত বেশি নির্ভয়। তবে তাদের এই আত্মবলিদানের বেশিরভাগটাই হচ্ছে ধর্মের নামে। ধর্মের বিভেদ ঘুচে গেলে আগামী কাল হয়তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, সামাজিক পরিবর্তনের জন্যও তাঁরা তেমনই সাহসিকতার সঙ্গে প্রাণ বিসর্জনে এগিয়ে আসবেন যেমন তাঁরা আজ আসছেন ধর্মের নামে। বিশেষ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রে একদিন সেই সময় অবশ্যই আসবে। পাঞ্জাবের খাকসার, সীমান্ত প্রদেশের পাঠান, যারা প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মধ্যেও অকুতোভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের ভীরু অপবাদ দেয়া তাদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপনেরই অপচেষ্টা।

ভীরুতার প্রকাশ তাদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়, যারা অনাহারে, অর্ধাহারে থেকেও অর্থসঞ্চয় করতে ভালোবাসে। মুসলমানেরা তাদের খানা-পিনা এবং অন্যান্য বেহিসেবি খরচের জন্য আগে থেকেই বদনামগ্রস্ত। ভীরু হওয়ার জন্য যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন সেগুলো কিন্তু মুসলমানদের স্বভাবে খুব বেশি দেখা যায় না। বস্তুত ভীরুতা পুঁটলিওয়ালাদের নিজস্ব সংস্কৃতি।

(৪) পাকিস্তানের অধিকারকে অস্বীকার করা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা— গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যারা দাবি করে, তারা কখনও কোনো প্রদেশের সংখ্যাগুরু অংশকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নিজেদের সঙ্গে রাখার জন্য বাধ্য করতে পারে না। একথা আমাদের সকলেরই জানা যে ভারতবর্ষে এমন অনেক অঞ্চল বা প্রদেশ আছে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব, পশ্চিম কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলে মুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য। পূর্ব বাংলাতেও অবস্থা সেই রকম। অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রবক্তারা এইসব প্রদেশের অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের অখণ্ড ভারতবর্ষে থাকতে বাধ্য করতে পারে না। যে কোনো আন্তর্জাতিক আদালতে এই বিষয়ে বিচারকের রায় অখণ্ড হিন্দুস্থানওয়ালাদের পক্ষে যাবে না। অখিল ভারতীয় কংগ্রেসের প্রয়াগ অধিবেশনে, এই সেদিনও হিন্দুমহাসভার প্রবক্তা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, অখণ্ড হিন্দুস্থানের এক প্রস্তাব কমিটিতে তুলে তাকে হিন্দুদের ভোটে অনুমোদন করিয়ে ভাবলেন যে মুসলমান জনতাও বোধ হয় তাঁর মতো করেই ভাবছে। কিন্তু প্রয়াগ অধিবেশনেই মুসলমান প্রতিনিধিদের ভোট এবং তার পরবর্তীকালে মুসলমান নেতাদের মতামতের বিষয়ে যদি একটু দৃষ্টি দিতেন, তাহলেই বুঝতে পারতেন যে হাওয়ার গতি

কোন্ দিকে। ওই অধিবেশনেই পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মিয়াঁ ইখতিয়ারুদ্দিন রাজাগোপালাচারির প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। সীমান্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তাঁর বক্তব্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করেছেন। অন্য পক্ষেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। আজাদ মুসলিম কনফারেন্স—যেখানে জামিয়াতুল-উলমা, অহরাব ইত্যাদি অনেক জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণার পোষক সংস্থা সামিল আছে—সেখানেও সম্পাদক ঠিক একই কথা বলেছেন। মুসলিম লিগ তো অনেক আগে থেকেই তাদের নীতি ঘোষণা করে দিয়েছে। এত কিছুর পরও পাকিস্তান অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা হবে কোন্ যুক্তিতে। খুব বেশি হলে একটা শর্ত আরোপ করা যেতে পারে যে অন্তিম নির্ণয় হবে ওই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের সার্বজনিক ভোটে।

অ-মুসলিম লিগ জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক কীরকম হবে সে বিষয়ে তাঁদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরাও মুসলমান জনতাকে তাঁদের পক্ষে রাখতে চান । এই মুহূর্তে ওইটুকু স্পষ্টবাদিতা যদি তাঁরা না দেখাতে পারতেন, তাহলে মুসলমান জনতার প্রতিনিধিত্ব করার কোনো অধিকার তাঁদের থাকত না।

ভারতবর্ষ এক বহুজাতিক দেশ

ভারতবর্ষ এবং অখণ্ড হিন্দুস্থান এই দুইয়ের হৈ-হট্টগোলের কারণে সকলেই ভাবছে ভারতবর্ষে বোধ হয় এই দুটি জাতিই শুধু বাস করে, অন্য কোনো জাতির কোনো অস্তিত্ব নেই। অতএব তাদের নিয়ে আলোচনারও কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমি প্রথম থেকেই জোরের সঙ্গে বলে আসছি জাতির ভিত্তি হল তার ভাষা। এজন্য ভারতবর্ষে যত ভাষা আছে, ততগুলি জাতিও আছে। এই সত্য আমাদের মেনে নিতে হবে। স্তালিন ভারতের জাতি সমস্যা সম্বন্ধে বলেছেন—

'এটা বলা নিয়ম হয়ে গেছে যে ভারতীয়রা কেবল একটি জাতিভুক্ত। কিন্তু যখন ভারতবর্ষে বিপ্লব সংঘটিত হবে, তখন এযাবৎকাল উপেক্ষিত, এরকম অনেক জাতি তাদের নাম-পরিচয়হীন অবস্থাকে ঝেড়ে ফেলে প্রকাশ্যে আসবে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়েই আসবে। যখন শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন জাতির অংশগ্রহণের প্রশ্ন আসবে, সেখানে আমি নিশ্চিত যে সেটা হবে প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব ভাষা এবং তাদের নিজেদের রীতি-রেওয়াজ অনুসারে।' *Leninism*, Vol. 1, P.277

জাতীয়তার ভিত্তি— এ বিষয়ে আগেই বলেছি যে জাতীয়তার ভিত্তিকে যদি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা যায়, তাহলে সেখানে ধর্মের চেয়েও ভাষাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। ধর্ম এক হলেই যদি সকলে এক জাতিভুক্ত হয়ে যেত, তাহলে মিশর, তুর্কি, ইরান, চিন, কোরিয়া ও জাপানকে এক জাতিভুক্ত বলা যেত। পাকিস্তান সম্বন্ধেও অনেকের ধারণা সেই রকম অর্থাৎ পাকিস্তান মানে একই জাতির এক দেশ। পাকিস্তানের অর্থ যদি ভারতের মুসলমান প্রধান অঞ্চল হয়ে থাকে, তাহলে সেই পাকিস্তান অঞ্চলেও একটি দুটি

নয় কম করেও এগারোটি জাতির বাসভূমি হবে, যাদের ভাষা হল—সিন্ধি, বেলুচি, বাহাই, মুলতানি, পশ্চিম পাঞ্জাবি, পশতো, কাশ্মীরি, দর্দি, বালতি আর পুবে পূর্ববাংলার তো নিজস্ব এক জীবিত ভাষা বর্তমান। এই ভাবে পাকিস্তানও প্রকৃত পক্ষে এগারোটি জাতির এক মহাসংঘ হয়ে উঠবে। ভাষার প্রশ্নটিকে শুধু পাকিস্তানের নাম করে উড়িয়ে দেয়া যাবে না, যেমন উড়িয়ে দেয়া যাবে না অখণ্ড হিন্দুস্থানের নামে ভারতের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিকে। এবিষয়ে আমি ইতিপূর্বে পশতো ভাষার উদাহরণ দিয়েছি, যে ভাষা ইতিমধ্যেই সীমান্ত প্রদেশের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষার ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে পাঞ্জাবি ভাষার গুরুত্ব বাড়ছে, সেই দিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত জাতিই তাদের নিজস্ব ভাষার স্বীকৃতির দাবি করতে আরম্ভ করবে এবং তাকে মেনেও নিতে হবে। যেখানে আন্ত- প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে উর্দুর চল থাকবে। পূর্ব বাংলার সমস্ত মুসলমান অধিবাসীকে শুধু পাকিস্তানের নামে নিজের মাতৃভাষা ত্যাগ করে উর্দুকে গ্রহণ করতে বলা যাবে না এবং সেই সঙ্গে এরকম আশা করাও উচিত নয় যে যেহেতু পাকিস্তানে এগারোটি পৃথক পৃথক জাতি আছে এতএব পাকিস্তানের দাবি মুসলমানেরা ত্যাগ করবে। এই দাবি পরিত্যক্ত হবে কি না তা একান্ত ভাবে নির্ভর করে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘু মুসলমানদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে এবং কোন্ নীতি গ্রহণ করে।

যেভাবে পাকিস্তান মানে একটি জাতির একদেশ, ধারণাটি ভ্রান্ত, সেই ভাবে বিহার প্রদেশেও এক জাতির তত্ত্বটি ভুল। ভবিষ্যতে যখন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের পূর্ণ বিন্যাস হবে, সেদিন বিহারের আদিবাসীদের মধ্যে থেকে মুন্ডা, ওঁরাও, হো এবং সাঁওতাল এই চারটি উপজাতির স্বায়ত্তশাসিত পৃথক প্রজাতন্ত্র হবে এবং যেখানে তারা সংখ্যাগুরু সেখানে তাদের মাতৃভাষা স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালতের ভাষা হবে।

আমরা যখন জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলি এবং ঘোষণা করি যে এই মহাযুদ্ধে জনগণ তাদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই লড়ছে, সেই অবস্থায় জনতাকে স্বাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলাই হবে আশু কর্তব্য এবং ওই লক্ষ্য পূরণ করতে হবে যথাসম্ভব কম সময়ে এবং সহজতম পদ্ধতিতে। যখন আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব, তখন দেখব যে জনগণের শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত তার মাতৃভাষা, সেটাকেই মাতৃভাষা বলব যেটা শিশুরা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই গ্রহণ করে। ব্যাকরণ পড়ে যে ভাষা শিখতে হয় তা কখনোই মাতৃভাষা নয়। আমরা যখন মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই নিজের ভাষা শিখি তখন ব্যাকরণ আপনা থেকেই শেখা হয়ে যায়। ব্যাকরণ ভাষার এক অভিন্ন অঙ্গ, কিন্তু পণ্ডিতেরা এটি তৈরি করে দিলেই তা সঠিক হয় না। যদি আমরা ভবিষ্যতের সোবিয়েত ভারতের চল্লিশ কোটি নাগরিককে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি শিক্ষিত করে তুলতে চাই তাহলে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সহজ ও সরল করতেই হবে এবং একমাত্র মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করলেই পদ্ধতি আপনা থেকেই সহজ হয়ে যায় এবং মানুষেরও শিক্ষিত হতে অনেক কম সময় লাগে।

শিক্ষাদানের পাশাপাশি বই, সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র ইত্যাদি মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করতে হবে ব্যাপক ভাবে, কিন্তু সেগুলি অবশ্যই মাতৃভাষায় হবে। নালন্দা গ্রামের এক স্কুল ছাত্রের উদাহরণ নেয়া যাক, আজ তাকে সমস্ত বিষয়ই পড়তে হয় হিন্দিতে, অথচ তার মাতৃভাষা মগহি। সাত বছর পড়ার পর সে মিডিল উত্তীর্ণ হয় কিন্তু সে তখন না পারে হিন্দি সংবাদপত্র পড়ে সম্যক বুঝতে না পারে হিন্দি সাহিত্যের যথার্থ রস গ্রহণ করতে। আর শুদ্ধ হিন্দি লেখা? সে তো চোদ্দো বছর ধরে লেখাপড়া চালিয়ে আসা পড়ুয়ার কাছেও আশা করা যায় না, সেখানে ওই সামান্য মিডিল পাস ছাত্রের কাছে কি আশা করতে পারি? যদি এ তথ্য বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনারা হিন্দি আই.এ., বি.এ. পড়ে এমন ছাত্রদের পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

যদি আমরা হিন্দিকে মগহি, মৈথিলি এবং ভোজপুরি (মল্ল)-দের মাতৃভাষা বানানোর নিরর্থক চেষ্টা না করি, আর যে ভাষা প্রকৃতই তার মাতৃভাষা, তাকে তার শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি, তাহলে সমস্ত প্রেক্ষাপটই দ্রুত পালটে যাবে। কোনো নিরক্ষর কৃষককে তিন দিনের মধ্যে নাগরি বর্ণমালা শিখিয়ে ফেলা যায়, তারপরই মগহি, মৈথিলি কিংবা ভোজপুরি যেটা তার মাতৃভাষা, সে ভাষায় ছাপা প্রাথমিক বইপত্র তার হাতে তুলে দিন। মাস খানেকের চেষ্টায় সে ওই সব বই আগ্রহ সহকারে পড়ে ফেলবে, বুঝে নেওয়ার ব্যাপারটা শেখার সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। এরপর দেখবেন লেখার সময় যদিও তার হ্রস্ব দীর্ঘ বানান চিহ্নে কিছু ভুল থাকছে, কিন্তু ব্যাকরণগত ভুল করা এখন তার সাধ্যের বাইরে। সভ্য সুসংস্কৃত হিন্দি শিখতে সাত বছর, তারপর উচ্চ শিক্ষায় আরও এগোতে হলে লাগে মোট চোদ্দো বছর, কিন্তু এত বৎসর ব্যয় করেও প্রকৃত শিক্ষা যেমন দূরে ছিল তেমনই থেকে যায়। অথচ এই ক্রমানুসারে চললে মাস কয়েকের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার বেড়াটা ডিঙানো যায়।

বইপত্র, সিনেমা, বেতার, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে কারণ এই ভাষায় কথা বলে এমন লোকের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। চল্লিশ লক্ষ লোক মগহি বলে, ভোজপুরি বলে এরকম লোকের সংখ্যা এক কোটিরও বেশি, এই সংখ্যার সঙ্গে তুলনা করা যাক পঁয়ত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যার দেশ ফিনল্যান্ড কিংবা দশ লক্ষ মানুষের দেশ আলবানিয়াকে। ওই সব দেশে সরকারের পক্ষ থেকেই জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করা হয়। যদি আমরা যুদ্ধোত্তর বিশ্বে জনগণকেই তার প্রভুরূপে দেখতে চাই তাহলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

প্রশ্ন উঠবে যে এইসব ভাষায় ডাক্তারি, ইনজিনিয়ারিং, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখালেখির জন্য যথেষ্ট পারিভাষিক শব্দ মজুত আছে কি নেই? এই প্রশ্নটিকে বাতিল করা চলে অনায়াসে। হিন্দি নিজেই পারিভাষিক শব্দের জন্য সংস্কৃত এবং অন্যভাষার মুখাপেক্ষী। হিন্দি পাঠরত বিহারি ছাত্রদের দশ-পনেরো বছর লেগে যায় একে আয়ত্ত করতে, তখন ওই সব মাতৃভাষাও তার প্রয়োজন মতো পারিভাষিক শব্দ ঠিকই সংগ্রহ

করে নেবে। মনে রাখতে হবে যে অন্য ভাষা থেকে ধার করে শব্দ এনে মাতৃভাষার মধ্যে ঢুকিয়ে অতঃপর তাকে শেখা আর সেই শব্দকেই তার ভাষাতেই স্মরণে রাখা এই দুটির জন্য ছাত্রদের যে পরিশ্রম করতে হবে তার মধ্যেও কিন্তু অন্তর থাকবে। প্রথম প্রক্রিয়াটির জন্য অল্প পরিশ্রমই যথেষ্ট, দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সে কথা বলা যাচ্ছে না। মাতৃভাষায় শিক্ষা পাচ্ছে এরকম ছাত্রদের পারিভাষিক শব্দগুলিকেই একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে শিখতে হবে, এখানে ব্যাকরণ প্রবচন ইত্যাদির কোনো বাধা নেই।

সোবিয়েত ইউনিয়নে জাতিসমস্যা— যখন থেকে জারশাহিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রাশিয়াতে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে তখন থেকেই সমগ্র জনগণকে স্বাক্ষর এবং শিক্ষিত করে তোলার কর্মসূচিকে সোবিয়েত সরকার অগ্রাধিকার দেয়। রাশিয়াতে রাশিয়ান, আর্মেনিয়ান, তুর্কি, জর্জিয়ান ইত্যাদি আধডজনের মতো প্রতিষ্ঠিত সহিত্যিক ভাষা আছে। যদি রুশ সরকার এই প্রতিষ্ঠিত ভাষাগুলির মাধ্যমেই শিক্ষার প্রসার ঘটাবার কর্মসূচি গ্রহণ করত তাহলে এই কয় বছরে দেশের মোট জনসংখ্যার চার শতাংশ শিক্ষিত হত কি না সন্দেহ। যারা হত, তাদের অবস্থা হত ওই সাতবছর স্কুলে পড়া বিহারি ছাত্রদের মতো। সোবিয়েত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে জনগণকে আমরা নতুন কোনো ভাষা দেব না, ভাষা জনতার কাছেই আছে, আমরা জনতাকে তাদের ভাষাতেই শিক্ষা দেব এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। রাশিয়ার মধ্য এশিয়া অঞ্চলে এক সময় লোক তাদের মাতৃভাষাটিকে গ্রাম্য মনে করে সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ভাষা তুর্কির মাধ্যমে লেখা পড়া শিখত। সোবিয়েত সরকার এই ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে দেখে যেহেতু শিক্ষার মাধ্যমটি ছাত্রদের মাতৃভাষা নয় সেজন্য এই ভাষার ব্যাকরণ, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি শিখতে বহুবছর ধরে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। এরপর সোবিয়েত সরকার, প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ভাষা তুর্কির মোহ ত্যাগ করে এবং তার পরিবর্তে স্থানীয় পাঁচটি কথ্য ভাষাকে গ্রহণ করা হয়। এগুলি হল—তুর্কমানি, করাকল্পকি, উজবেকি, কাজাখি এবং কিরঘিজি। এর মধ্যে করাকল্পকি ভাষা ব্যবহার করে এরকম লোকের সংখ্যা মেরেকেটে পঞ্চাশ হাজারের মতো ছিল। কাজাখিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান সোবিয়েত ইউনিয়নের ষোলোটি অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের অংশ। এই জাতিগুলিকে সোভিয়েত সরকার সর্বোচ্চ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়েছে এবং সোভিয়েত গঠনতন্ত্র অনুসারে তারা ইচ্ছানুসারে সোবিয়েত ইউনিয়ন ত্যাগ করতেও পারে।

সোবিয়েত ইউনিয়নে শতাধিক জাতি আছে এবং তাদের নিজস্ব ভাষাও আছে। দেশের বহুজাতিক হওয়াকে সোবিয়েত ইউনিয়ন কোনো লজ্জার বিষয় মনে করেনি। সোবিয়েতের মানুষ মনে করে এই ভিন্নতা, বৈপরীত্য ইত্যাদি তাদের সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। আজ তারা সেদিনের সেই কর্মসূচি গ্রহণের সুফল পাচ্ছে। আজ সোবিয়েত খাদ্য সম্ভারে যুক্ত হয়েছে প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠতম খাদ্যটি, সোবিয়েত নৃত্যকলা জর্জিয়া, তাজিক, কাজাখদের নৃত্যকলাকে আত্মস্থ করে আরও উন্নত হয়েছে। সোবিয়েত চলচ্চিত্রকে পূর্ণতা

দিতে এই সব জাতিগোষ্ঠী থেকে আনা অভিনেতা, কলাকুশলীদেরও যথেষ্ট অবদান আছে। সোবিয়েত সাহিত্যে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মহৎ রচনা অনুবাদ হয়ে তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ সোবিয়েতের দুই নিরক্ষর কবিকে ধরতে পারি। সুলেমান স্তালস্কি, দাগেস্তানের (ককেশিয়া) এক নিরক্ষর, কিন্তু জন্মগত প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন। রুশ বিপ্লবের আগে থেকেই তিনি প্রচুর কবিতার জন্ম দিয়ে এসেছেন। তাঁর কবিতা মূলত ছিল জমিদার, স্থানীয় ভাষায় যাদের বলা হয়, পেগো, মোল্লা এবং জারশাহির অত্যাচারী আমলাদের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষের প্রেম, বিরহ, জীবন-সংগ্রাম নিয়েও তিনি প্রচুর কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। জার আমলে সুলেমান স্তালস্কির গ্রাম্য গীতিকাব্য তেমন সমাদর পায়নি। বিপ্লবের পর ককেশাসের পাহড়ে অরণ্যে অযত্নে লালিত সুলেমানকে বিপ্লবী সরকার খুঁজে বার করে, তাঁর প্রতিভাকে আরও বিকশিত হবার সুযোগ করে দেয়। সুলেমানও প্রেরণা পেয়ে নতুন করে কাব্য সৃষ্টিতে উৎসাহী হন। দাগেস্তানি, ভাষা বিপ্লবের পর আর গ্রাম্য অসংস্কৃত ভাষা রইল না, সে তখন সোবিয়েতের অন্তর্গত এক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের জাতীয় ভাষা। ওই ভাষা স্কুলে, কলেজে, অফিসে আদালতে সর্বত্র ব্যবহৃত হত। প্রচুর বই, সংবাদপত্র এই ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকল। সুলেমানের কবিতা এখন আর একবার মাত্র গীত হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেত না। দাগেস্তানের পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত এবং এই ভাবেই সুলেমানের কবিতা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে যায়। সুলেমানের একটি কাব্যগ্রন্থ গোর্কির নজরে আসে, তিনি পড়ে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি সুলেমানের অন্যান্য কবিতাও রুশ ভাষায় তর্জমা করে পড়েন। এরপর সুলেমানের কবিতা সোবিয়েতের অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। নিরক্ষর সুলেমান বিশ্বের প্রথম সারির কবিদের একজন বলে গণ্য হতে থাকেন। পরবর্তীকালে সুলেমান দাগেস্তান থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সোবিয়েত পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন, কিন্তু সেইদিনই (ডিসেম্বর ৬, ১৯০৮) তাঁর মৃত্যু হয়।

নিরক্ষর কাজাখ কবি জুম্বলের কাব্য সাধনার ইতিহাসও সুলেমান স্তালস্কিরই মতো। রুশ বিপ্লবের সময় তিনি যথেষ্ট বয়স্ক ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিপ্লবের পরই তিনি তাঁর কাব্য প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পান। স্তালস্কি কিংবা জুম্বলের মাতৃভাষাকে গ্রাম্য, পশ্চাদপদ বলে যদি উপেক্ষা করা হত তাহলে সোবিয়েত ইউনিয়ন তথা বিশ্ব এই দুই প্রতিভা থেকে বঞ্চিত হত। আমাদের দেশেরও অনেক সুলেমান, অনেক জুম্বলেরা উপেক্ষিত অবস্থায় আছে এবং সেই অবস্থাতেই হারিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে আমাদের দেশে যখন জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এই সমস্ত প্রতিভারা আর উপেক্ষিত থাকবে না।

সোবিয়েত ইউনিয়ন ভাষার ভিত্তিতে তাদের প্রজাতন্ত্রগুলিকে গঠন করে আমাদের সামনে এক সার্থক উদাহরণ উপস্থিত করেছে। আমাদের দেশের জাতি সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদেরও সেই পথেই হাঁটতে হবে।

ভারতের জাতি—আমি জাতির সঠিক পরিচয়ের জন্য মাতৃভাষাকেই কষ্টিপাথর মনে

করি এবং মাতৃভাষা তাকেই বলা যায় যা বলতে গিয়ে ব্যাকরণের বাধার মুখে পড়তে হয় না। এই কষ্টিপাথর নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ আমাদের ঘুরতে হবে। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে দেশের যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু এবং যতদিন তারা ওই সব প্রদেশকে হিন্দুপ্রধান অঞ্চল থেকে আলাদা করার দাবি নিয়ে বদ্ধপরিকর থাকবে ততদিন তাদের দাবিকে উপক্ষো করা চলবে না, জাতি সমস্যা আলোচনা কালে এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এভাবে দেখলে, আগেই যেমন বলা হয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানে নয়-দশটি এবং পূর্ব পাকিস্তানে একটি—পূর্ববঙ্গ—এই এগারোটি প্রদেশ বা প্রজাতন্ত্র হবে। পাকিস্তান পরিকল্পনার মাধ্যমে লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদ এবং অন্ধ্র অঞ্চলের কিছু জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে যে অতিরঞ্জিত মানচিত্র তৈরি হয়েছে, সেগুলো নেহাতই স্বপ্নে পোলাও রাঁধার সময় অতিরিক্ত ঘি ঢালার খোয়াবের মতোই অবাস্তব। কোনো আন্তর্জাতিক আদালত অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশকে মাত্র কয়েকটি পকেটের জনসংখ্যার সামান্য হেরফেরের কারণে মুসলিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার পক্ষে রায় দেবে না। যেখানে জনসংখ্যার বিভাজন প্রায় সমান সমান, যেখানে কারা প্রকৃত সংখ্যাগুরু এটা নির্ণীত হওয়ার পথে অনেক গণ্ডগোল, সেখানে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের ভোটের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা যাচাই করা যেতে পারে,

ভারতবর্ষের সমস্ত জাতিগুলিকে, তাদের মাতৃভাষার ভিত্তিতে নতুন প্রদেশ বা প্রজাতন্ত্রে ভাগ করার চেষ্টা করি। আমাদের সূচি এখনও অসম্পূর্ণ, ভাষার সংখ্যা আমাদের তালিকার সংখ্যা থেকে বেশিও হতে পারে।

১। **বিহার:**

১) মল্ল (ভোজপুরি ভাষাভাষী অঞ্চল)— চম্পারণ, সারণ, শাহাবাদ (যুক্তপ্রদেশের) গোরখপুরের দেওরিয়া তহসিল, গোরখপুর, বালিয়া, আজমগড় এবং গাজিপুর জেলার কিছু অংশ।

২) বজ্জি—পশ্চিম মজফ্‌ফরপুর জেলা

৩) বিদেহ (মৈথিলি)— দ্বারভাঙ্গা, চম্পারণ, পুর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ।

৪) অঙ্গ (ছিকাছি ভাষা)—ভাগলপুর, মুঙ্গের, পুর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ।

৫) মাগহি (মাগধি) — পাটনা, গয়া, হাজারিবাগ ও মুঙ্গের জেলার কিছু অংশ।

৬) মুন্ডা
৭) ওঁরাও } ছোটনাগপুর
৮) হো

৯) সাঁওতাল— সাঁওতাল পরগনা।

১০) রাঢ় —মানভূম, সিংভূম

২। **যুক্তপ্রদেশ : মল্ল**

১) কাশী, ২) দক্ষিণ অযোধ্যা, (৩) উত্তর অযোধ্যা, ৪) উত্তর ব্রজ, ৫) পশ্চিম ব্রজ,

৬) পূর্ব কুরু (খড়িবুলি), ৭) বুন্দেলখণ্ড, ৮) কূর্মাচল (পূর্ব পাহাড়ি)।

৩। **মধ্যপ্রদেশ:**

১) চেদি (জব্বলপুরি), ২) দক্ষিণ কোশল (ছত্তিশগড়ি), ৩) গোন্ডা, ৪) নিমাড, ৫) মালব, ৬) বাঘেলখণ্ড, ৭) উত্তর মহারাষ্ট্র ।

৪। **রাজপুতানা:**

১) মেবার, ২) মাড়ওয়াড়, ৩) মেড়ওয়াড়।

৫। **দিল্লি:** পশ্চিমকুরু (হরিয়ানভি)।

৬। **পাঞ্জাব:**

১) পূর্ব পাঞ্জাব, ২) পশ্চিম পাঞ্জাব, ৩) পশ্চিম পাহাড়ি, ৪) কনৌর, ৫) স্পীতি, ৬) লাহুল (পশ্চিম কুরু)।

৭। **কাশ্মীর:**

১) জম্মু, ২) লাদাখ, ৩) বালতিস্তান, ৪) দর্দস্তান, ৫) হুঞ্জা, ৬) কাশ্মীর।

৮। **সীমান্ত প্রদেশ:**পশতো।

৯। **বেলুচিস্তান:**

১) বালুচি, ২) বাহাই।

১০। **সিন্ধু:** সিন্ধি।

১১। **বোম্বাই :**

১) কচ্ছ, ২) সৌরাষ্ট্র (কাথিওয়াড়), ৩) গুজরাট, ৪) দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, ৫) কোঙ্কন, ৬) কর্ণাটক।

১২। **মাদ্রাজ:**কর্ণাটক ।

১) তুলু ২) কুর্গ, ৩) কেরল (মালায়লম), ৪) তামিলনাড়ু, ৫) অন্ধ্র (তেলেগু)।

১৩। **উড়িষ্যা:**উৎকল।

১৪। **বাংলা:**রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ)।

১) মধ্যবঙ্গ, ২) পূর্ববঙ্গ, ৩) চট্টগ্রাম, ৪) শর্বা-লেপচা-গোর্খা, ৫) কোচ।

১৫। **আসাম:**পূর্ববঙ্গ।

১) আসাম, ২) নাগা, ৩) গারো, ৪) খাসি, ৫) জয়ন্তিয়া, ৬) মণিপুর, ৭) মিশ্রি।

১৬। **ভুটান ।**

১৭। **নেপাল:**

১) গোর্খা, ২) নেওয়ার, ৩) তমঙ, ৪) থারু, ৫) শর্বা।

১৮। **আন্তপ্রাদেশিক ভাষা:**

(১) হিন্দি, (২) উর্দু, (৩) ইংরাজি।

এভাবে ভাগ করলে প্রায় সত্তরের বেশি জাতি হয়।

হিন্দিকে যদি কথ্য ভাষা হিসেবে ধরা যায় তাহলে এটি মিরাট কমিশনারি অঞ্চলের

ভাষা, সাহিত্যিক হিন্দি বা উর্দু কোনো বিশেষ প্রদেশের ভাষা নয়, এই ভাষা কিছু বাছাই করা শহরে বিশেষ বিশেষ পরিবারেই ব্যবহৃত হয়। আন্তপ্রাদেশিক ভাষা হিসেবে এটির বহুল ব্যবহার হচ্ছে এবং আগামী দিনে আরও বাড়বে। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে উর্দু হবে আন্তপ্রাদেশিক ভাষা, অবশিষ্ট জায়গাতে হিন্দি। এই ভাষা যারা ব্যবহার করে, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্কুল খুলতে হবে।

আমাদের দেশে কয়েক লক্ষ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বাস করে যাদের ভাষা ইংরেজি এ ছাড়া আরও কিছু সীমিত সংখ্যার জাতি আছে যারাও ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করে। তবে এরা দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। এদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য পর্যাপ্ত ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ভারতীয় ইউনিয়নের যে কোনো ভাষাভাষী মানুষকে যদি জীবিকা কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে নিজের জাতি অধ্যুষিত এলাকা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকতে বাধ্য হতে হয় সেখানেও যাতে তাদের সন্তানেরা যথাযথ ভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য সেই বিশেষ অঞ্চলেই বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণির পঠনপাঠনের জন্য বই পত্রের ব্যবস্থা করার সময় ছাত্রসংখ্যা কম থাকলে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেগুলি দূর হয়ে যাবে। ছাত্ররা যে কোনো উন্নত ভাষায় প্রয়োজনীয় বইপত্র পড়ে নেবে এবং পরীক্ষার খাতায় মাতৃভাষাতেই উত্তর লিখবে। তবে এরকম সমস্যা সেই ভাষাভাষী ছাত্রদেরই হতে পারে, যাদের ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা এক লক্ষেরও কম।

মাতৃভাষার সমস্যা

মাতৃভাষা সম্বন্ধে কিছু বলার আগে হিন্দি ভাষা সম্বন্ধে আমার অবস্থান স্পষ্ট করে দিতে চাই। কারণ একে নিয়েই অনেক বন্ধু নানা কল্পনার ফানুস আকাশে ওড়াতে থাকেন। আজকের যুগ ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীকে আত্মসচেতনতা দিয়েছে, জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জাতিগুলিকেই পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। রেল-জাহাজ-বিমান বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার দূরত্বকে প্রায় শূন্যের স্তরে নামিয়ে এনেছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের—প্রদেশের—মানুষ একে অন্যের কাছকাছি হবার সুযোগ পাচ্ছে। আগে যেমন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে মানুষের যাতায়াত হত সেটাই এখন বিস্তৃত হয়ে গ্রাম, প্রদেশ ছাড়িয়ে দেশে দেশে বিস্তৃত হয়েছে। আজ কলকাতা- বোম্বাই-কানপুর -আমেদাবাদ-জামশেদপুর-জামালপুর ইত্যাদি কলকারখানা সমৃদ্ধ শহরগুলিকে দেখলেই বোঝা যায় যে কী ভাবে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মজুর-মজুরনিরা এক জায়গাতে একই গ্রামের অধিবাসীদের মতো বাস করে। এই কারণেই ওই সব জায়গাতে লোকজন নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদানের জন্য একটি সম্মিলিত ভাষার প্রয়োজন উপলব্ধি করেই থেমে থাকেনি। তার জন্য সরল এক হিন্দিভাষাও ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। বর্তমান যুগে একটি সম্মিলিত ভাষার প্রয়োজন কেন এটা না বোঝা এক আশ্চর্যের বিষয় এবং হিন্দি এই সম্মিলিত ভাষা হবার পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত, এ বিষয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই।

নিত্যদিন কাজকর্মের সময় নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য হিন্দির বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং সেজন্য হিন্দির যথাযথ প্রচার-প্রসারে আমরাও আগ্রহী। আমরা এই প্রয়াসকে আরও জোরদার করার পক্ষপাতী। কৌরবি ভাষা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্লেষণ থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

আমাদের বক্তব্য এই যে মিরাট কমিশনারির (কুরু জনপদ) পৌনে চার জেলা বাদ দিলে বাকি সমস্ত অঞ্চলেই নিজ নিজ মাতৃভাষা আছে। এই বক্তব্য মেনে নিলে পরবর্তী কাজকর্ম অনেক সহজ হয়ে যাবে। পাঞ্চালী (রোহিলখন্ডি), ব্রজ (সৌরসেনি), বুন্দেলখন্ডি (দার্শানি), বাঘেলখন্ডি (চেদিকা), বাৎসি (দক্ষিণ অযোধ্যা), কাশীকা (বারাণসী-মল্লিকা -ভোজপুরি) ইত্যাদি ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা লক্ষে নয় কোটিতে গুণতে হবে এবং এগুলি এই জনপদের মানুষের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা বিষয়ে আমাদের সংজ্ঞা হল, যে ভাষা বলতে গিয়ে নিরক্ষর বয়স্ক মানুষ থেকে আরম্ভ করে অল্প বয়সি বালকও ব্যাকরণের ভুল করে না। আপনি বরসান অঞ্চলের পাঁচ বছরের কোনো বালকের সঙ্গে ব্রজভাষায় কথা বলুন, ছেলেটি জীবনে ব্যাকরণের হয়তো নামও শোনেনি, কিন্তু আপনার কথায় কোনো ব্যাকরণগত ভুল থাকলে সে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলবে। শিশুরা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই

তার মাতৃভাষা এবং সেই সঙ্গে সেই ভাষার সাধারণ ব্যাকরণ শিখে ফেলে। এই ব্রজভাষাকে আপনি হিন্দি থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন এমনও বলতে পারবেন না। যদি অভিন্নই হত তাহলে এই সব ভাষায় কথা বলা ছাত্ররা স্নাতক স্তরে গিয়েও হিন্দিতে পাহাড় প্রমাণ ব্যাকরণের ভুল করত না। আমার কথার প্রমাণ চাইলে আমি সাম্প্রতিক কালের মিডিল তথা আপার মিডিল স্তরের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র দেখতে বলব কিংবা নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে বলব।

মানব জাতির আজ পর্যন্ত অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার এবং প্রতিনিয়ত বিস্তৃত জ্ঞান—দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি—ইত্যাদির আমরা উত্তরাধিকারী। সেই জ্ঞানকে লাভ করা এবং তাকে জীবনে প্রয়োগ করাই আমাদের বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত। এই জ্ঞান কিন্তু সর্বদাই ভাষার মোড়কে আবৃত থাকে এবং ভাষার সাহায্যেই সেই জ্ঞান আমরা পেতে পারি। এখন প্রশ্ন একটাই—আপনি কি জনগণকে সহজে এবং কম সময়ে ভাষা শিক্ষা দিতে চান? আপনি কি বলবেন— অবশ্যই! কিন্তু আপনার বলা এখানে নিরর্থক। কারণ আপনার মতামত কাশীকা-মল্লিকা (ভোজপুরি) ভাষাভাষীদের কাছে এই শর্তই পেশ করেছে যে—তোমরা প্রথমে আট-দশ বছর ধরে চেষ্টা করে অগে হিন্দি শেখ, তারপর জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করার কথা চিন্তা কোরো। এটাই অসুবিধার বিষয় যে শহরের মুষ্টিমেয় কিছু হিন্দির প্রবক্তা এবং অনেক বছরের চেষ্টায় খানিক হিন্দি শেখা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের সমস্যাকে মোটে আমলই দিতে চান না।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করলে প্রগতি যে কত দ্রুত হতে পারে তার সুন্দর উদাহরণ আমরা পেতে পারি, সোবিয়েত এশিয়ার তুর্কমেন, কিরঘিজ, কাজাখ, উজবেক ইত্যাদি জাতিগুলির শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির অগ্রগতি দেখে। ১৯১৭ পর্যন্ত এই জাতিগুলি সর্ববিষয়ে ভারতীয় জাতিগুলির চেয়ে সর্বাংশে পিছিয়ে ছিল। জারশাহি চাইত না যে এই এশিয়ান জাতিগুলি শিক্ষিত হোক, সেই উদ্দেশ্যে তারা বিদ্যালয় স্তরে রুশ ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করেছিল। শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায় আবার তুর্কি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চাইত। তুর্কি ভাষা মধ্য এশিয়ার এই জাতিগুলির মাতৃভাষার অনেকটা কাছাকাছি ছিল, তা সত্ত্বেও, মাতৃভাষার জায়গা সে কী ভাবে নিতে পারে? মোটামুটি শিক্ষিত হয়ে জ্ঞানভাণ্ডারের দরজার কাছে পৌঁছোতে রুশভাষার লাগত দশ বছর, তুর্কির লাগত আট বছর। রুশ এবং তুর্কি ভাষার সমর্থকেরা মধ্য এশিয়ার এই জাতিগুলিকে শিক্ষিত তো দূরের কথা, মোটামুটি স্বাক্ষর পর্যায়েও দেখতে চাইত না। সেই ভাবনা থেকেই এদের মাতৃভাষাকে উপেক্ষিত রাখা হয়। ১৯১৭-তে জনগণের বিপ্লব সফল হয়, কিন্তু সেই সাফল্যকে ধরে রাখার জন্য, বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য জনতাকে স্বাক্ষর এবং শিক্ষিত করাটা সে দেশের বিপ্লবী নেতৃত্বের কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় এবং তাঁদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে এই সব পশ্চাদপদ জাতির অবহেলিত মাতৃভাষার দিকে। মধ্য এশিয়ার এই জাতিগুলির ভাষার কোনো বর্ণমালা ছিল না, সাহিত্য থাকার তো প্রশ্নই ওঠে

না অথচ বিপরীতে রুশ ও তুর্কি ভাষার এক বিশাল সাহিত্যভাণ্ডার ছিল এবং যার ব্যাপ্তিও ছিল বিশাল। কিন্তু বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ জানতেন যে তুর্কি কিংবা রুশ ভাষা যতই সমৃদ্ধ হোক না কেন, ওই ভাষার মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত কিংবা স্বাক্ষর করে তুলতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন অথচ সামাজিক সংস্কারের কর্মসূচিতে সমস্ত জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সেই জনগণ হবে শিক্ষিত। তাছাড়া জনগণকে, যা তার মুখের ভাষা নয়, এমন একটা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না, এই তত্ত্বও বিপ্লবী নেতৃত্বের জানা ছিল। নেতৃত্ব এজন্যই স্থির করলেন যে রুশ এবং তুর্কি ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারকে ওই জাতিগুলির নিজস্ব ভাষায় পরিবর্তিত করে জনতার সামনে উপস্থিত করতে হবে। বিপ্লবী নেতৃত্ব সেই কাজটিই করতে আরম্ভ করেন এবং তারই ফলে মধ্য এশিয়ার এই জাতিগুলির জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। যে উজবেক ভাষায় আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে একখানাও ছাপা বই ছিল না, আজ সেই ভাষাই তাসখন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের মাধ্যম। সেই ভাষাতে অজস্র দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। উজবেকি ভাষায় হাজার হাজার বই ছাপা হচ্ছে। কিছু প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ব্যক্তিগত জেদের কথা বাদ দিলে ওখানে একজন লোকও অশিক্ষিত নেই। স্বাক্ষরতা প্রচারের আন্দোলন শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

'মাতৃভাষা মাইকি জয়' এই ধ্বনি দিয়ে লোককে আমরা উন্মাদ করে তুলতে চাইছি না। কোটি কোটি মানুষকে কয়েক বছরের মধ্যে স্বাক্ষর করে তোলার কথা যদি ভেবে থাকি, তখন এছাড়া 'ন্যান্য পন্থা'। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীদের মতো আমরাও যদি মুষ্টিমেয় শেঠ কিংবা বাবুদের শিক্ষিত করে, তাদের শাসক শ্রেণিতে উন্নীত দেখতে চাই এবং সেই সঙ্গে যদি বাসনা থাকে যে শতকরা নব্বই শতাংশ মানুষ অশিক্ষিত থেকে যাক, যাতে শাসক শ্রেণির যা ইচ্ছা তাই করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না হয়, তাহলে মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো বিজাতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা যথার্থ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে আজকালকার কলকারখানাতেও শিক্ষিত মজুরের প্রয়োজন হয়, আধুনিক জটিল অস্ত্রশস্ত্রের সঠিক প্রয়োগ অশিক্ষিত সৈনিকের দ্বারা সম্ভব নয়।

অনেকে আবার ভাবেন যে যদিও এই গ্রামীণ ভাষায় অনেক সুললিত গীত, গাথা কাহিনি, প্রবচন, লোককথা শোনা যায়, কিন্তু যেহেতু এই ভাষার কপালে আশু মৃত্যুর নোটিশ টাঙানো হয়ে গেছে, অতএব ওই সব সম্পদকে অবিলম্বে সংগ্রহ করে ফেলা হোক, যাতে কালের গর্ভে এগুলো হরিয়ে না যায়। এই সব মহান ব্যক্তিদের কাছে মাতৃভাষার মূল্য ওইটুকুই। যাঁরা মাতৃভাষাকে সকলের কাছে করুণার পাত্র হিসেবে উপস্থিত করতে চান, তাঁরাও যথেষ্ট ভ্রান্তির মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের কি তাহলে ধরে নিতে হবে যে ব্রজভাষা শেষ নিশ্বাসের প্রতীক্ষা করছে, অবধি ভাষা মৃত্যুশয্যায়, মৈথিলি ভাষা স্বপ্ন হয়ে যাবার পথে? এই সমস্ত ভাষা যারা ব্যবহার করে সেই কোটি কোটি মানুষকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, জিজ্ঞাসা করুন সুর, তুলসী, বিদ্যাপতিকে। যদি সুর, তুলসী, বিদ্যাপতির

মুখোমুখি হতে চান তাহলে মল্লিকা (ভোজপুরি), বুন্দেলি, বাঘেলি, মৈথিলি ইত্যাদি ভাষা জানতেই হবে। ওই সমস্ত ভাষার এক একটিতে কথা বলে এমন লোকের সংখ্যা আলাদা একটি দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা বেলজিয়ামের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশি। তাই যাঁরা এই সব গ্রামীণ ভাষার মৃত্যুর সমন জারি করতে উৎসাহী, তাঁদের বলি, অনুগ্রহ করে ধৃষ্টতা থেকে বিরত থাকুন। যদি আপনাদের মতো মানুষের আনুকূল্য না পেয়েও এই সব ভাষা এতকাল জীবিত থেকে থাকে তাহলে ভবিষ্যতেও থাকবে। অনেক সুর, তুলসী, বিদ্যাপতি আপনাদের দ্বারা হেয় হয়েছে, তাদের যথার্থ কদর করেননি, তারা যাতে বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যায়, নিজেদের উদাসীনতা দিয়ে নিরন্তর সেটা চেষ্টা করে গিয়েছেন, তা সত্ত্বেও অঙ্কুর বিনষ্ট হয়নি, একটু সহায়ক অবস্থা পেলেই তারা আবার স্ব-মহিমায় দেখা দেবে। ভবিষ্যৎ তাদেরই।

আমরা গীত, কাহিনি, প্রবচন ইত্যাদি সংগ্রহের বিরোধী নই বরং এই প্রচেষ্টাকে জোরদার সমর্থন করি। কিন্তু আমরা তাকে কোনো সংগ্রহশালার নির্জীব বস্তু কিংবা পিঁজরাপোলে অন্তিমক্ষণের জন্য অপেক্ষা করা প্রতিবন্ধী গোজাতির অবস্থায় দেখতে চাই না। আমরা তাকে জনপদের ভাষা রূপে দেখতে চাই, আমরা তাকে দেখতে চাই প্রাইমারি স্তর থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম রূপে— সংক্ষেপে, নিজের বাড়ির গৃহিণীর ভূমিকাতেই তাকে আমরা দেখতে চাই। জনগণের ভাষা যখন গৃহের গৃহিণী হবে, তখনই জনতার মধ্যে নিজের ঘর সামলাবার ক্ষমতার জন্ম হবে।

মাতৃভাষার কথা উঠলেই কিছু লোক চটজলদি প্রশ্ন করেন— পাঠ্য পুস্তক কই? কী নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে? লিখবে কারা? প্রকাশক মিলবে তো? পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ হবে কোথা থেকে, এরকম বিরাট পরিবর্তনের অধিকার তাকে কে দিয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। সাধারণভাবেও মানুষের মনে প্রশ্নগুলি উদিত হয় এবং এর জবাবের জন্য বিরাট যুক্তিজাল বিস্তারেরও কোনো প্রয়োজন নেই। যে ভাষায় লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়বে তার পরিকাঠামো তৈরি হতে কত সময় লাগতে পারে? কে বই লিখবে? যে ভাষায় এত কবি, কাহিনিকার সৃষ্টি হয়েছে সে ভাষায় লেখকের অভাব কি? ব্রজভাষায় লিখবেন বাণারসী দাস চতুর্বেদী, হরিশংকর শর্মা। কিশোরি লাল গোস্বামী, গুলাব রায় ইত্যাদিরা লিখবেন বুন্দেলি, মৈথিলি শরণ, সিয়ারামশরণেরা লিখবেন কৌশলি (উত্তর অবধ), নিরালা, দেবীদত্ত শুক্লর মতো শক্তিশালী লেখনী পাবে বাৎসি, কাশীকা লিখবেন চন্দ্রাবলী পাণ্ডে, বিশ্বনাথ প্রসাদ, মল্লিকাতে উদয়নারায়ণ তেওয়ারি, শিউপূজন সহায় এবং মনোরঞ্জন প্রসাদের পূর্ণ অধিকার আছে, মৈথিলি লিখবেন অমরনাথ ঝা, রাকেশ, উমেশ মিশ্র প্রভৃতি, কৌরবি বাসুদেব শরণ অগ্রবালের মাতৃভাষা। এই ভাবে দেখলে এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে ওই ভাষার দু-চারজন লেখকের উপস্থিতি নেই। মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম, এই তত্ত্বকে একবার যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে 'লেখক কোথায়' এই দুর্বল চিন্তায় মস্তিষ্ককে ঘর্মাক্ত করা নিরর্থক। হিন্দির অধিকাংশ লেখকেরই মাতৃভাষা হিন্দি নয়, বরং

মল্লিকা, কাশীকা ইত্যাদি। প্রকাশক পাবার চিন্তাও অমূলক। শয়ে শয়ে প্রকাশক তখন আপনার পিছনে ছুটবে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রবেশিকা পর্যন্ত বই তৈরি হয়ে যাওয়াটা খুব বেশি হলে বছর খানেকের ব্যাপার। পারিভাষিক শব্দের অভাব হিন্দিতেও যথেষ্ট আছে, আর সংস্কৃত ভাষার শব্দ ভাণ্ডার তো মাতৃভাষার কাছেও উন্মুক্ত। জার্মান ভাষার মতো মাতৃভাষাও আপন যাত্রাপথে হাজারও পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করে নেবে, ইতিমধ্যে এরকম কিছু হয়েও গিয়েছে— যেমন বাইসাইকেল (সাইকেল) স্টিমার (অগিন-বোট) ইত্যাদি। একটু খোঁজ-খবর করলে দেখা যাবে যে এরকম হাজার খানেক চলতি পারিভাষিক শব্দ জনপদগুলিতে এখনই মজুত আছে। রেডিও, রেল, স্টেশন, টিকিট ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ভাষার শব্দকে তো তার যথার্থ রূপেই গ্রহণ করা চলে।

মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার যেমন জন্মসিদ্ধ অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা। যে কোনো প্রদেশের জাতীয়তাবাদী মন্ত্রীসভা একাজের দায়িত্ব নিতে পারে। সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসি মন্ত্রীসভা পশতো ভাষাকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। এভাবে যদি বুন্দেলখণ্ডে বুন্দেলি, ব্রজতে ব্রজভাষা, অযোধ্যায় অবধিকে কোনো মন্ত্রীসভা শিক্ষার মাধ্যম রূপে অনুমোদন দেয়, মনে হয় তাতে ইংরেজ মহাপ্রভুরা বাদ সাধবে না।

শাসক শ্রেণি তার সুবিধার্থেই এযাবৎকাল আমাদের দেশের প্রদেশগুলিকে বিভাজন করে এসেছে এবার জনতার সুবিধার্থে সেগুলির পুনর্বিন্যাস করতে হবে। তিনটি প্রদেশের জায়গায় যদি তিরিশটি প্রদেশ হয়, তাতে ব্রিটিশ প্রভুরা আপত্তি করবে এরকম ধারণা পোষণ করে রাখলে চলবে না। শ্বেতহস্তী সদৃশ আই. সি.এস. মহাপ্রভুদের যাঁতাকলে ভারতবর্ষ কী চিরকালই এরকম পিষ্ট হতে থাকবে। যদি সেটাই ভবিতব্য হয়, তাহলে দুঃখ কীসের, তিনের বদলে তিরিশজন আই.সি.এস. লাট সাহেব হবার সুযোগ পাবে।

আমাদের এই বিশাল দেশকে আবার নতুন নতুন প্রদেশ, জনপদে ভাগ করতে হবে। ভারতের অখণ্ডতা নষ্ট হচ্ছে এই খেদ অকারণ। আজ এগারোটি প্রদেশ এবং ছ'শোটির বেশি দেশীয় রাজ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ভারতবর্ষের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থেকে থাকে, তাহলে প্রদেশের সংখ্যা কিছু বাড়লেও অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হবে না। যখন বাংলা, উড়িয়া, গুজরাটি, মারাঠি ইত্যাদিদের অখণ্ড ভারতের আওয়াজ তুলে আত্মহত্যা কিংবা আত্মগোপন করতে বলা যাচ্ছে না তখন বেচারি ব্রজভাষী, বুন্দেলি, মল্লিকা, মৈথিলি ইত্যাদি জনপদের ভাষাগুলি কী অপরাধ করল? এই ভাষা কী আমরা নিজেরা তৈরি করেছি? এই ভাষা তো বিবর্তনের ইতিহাসের পথ ধরে নিজেরাই আবির্ভূত হয়েছে, ভাবালুতার দাবিতে নয়, উপযোগিতার দাবিতেই এই ভাষাগুলি জীবিত থাকার অধিকার দাবি করছে।

ভারতের হিন্দি উর্দু প্রদেশকে (পাঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও এতদঞ্চলের দেশীয় রাজ্যগুলি) নিম্নলিখিত জনপদে ভাগ করতে হবে।

	ভাষা	জনপদ	কেন্দ্র
১)	হিন্দকি	পশ্চিম পঞ্জাব	রাওয়ালপিন্ডি
২)	মধ্য পাঞ্জাবি	মধ্য পাঞ্জাব	লাহোর
৩)	পূর্বি পাঞ্জাব	পূর্ব পাঞ্জাব	লুধিয়ানা
৪)	সিন্ধি	সিন্ধু	করাচি
৫)	মুলতানি	মুলতান	মুলতান
৬)	কাশ্মীরি	কাশ্মীর	শ্রীনগর
৭)	পশ্চিম পাহাড়ি	ত্রিগর্ত	কাংড়া
৮)	হরিয়ানভি	হরিয়ানা	দিল্লি
৯)	মাড়ওয়াড়ি	মাড়োয়ার	যোধপুর
১০)	বৈরাঠি	বিরাট	জয়পুর
১১)	মেবারি	মেবার	চিতোর
১২)	মালবি	মালব	উজ্জয়িনি
১৩)	বুন্দেলি	বুন্দেলখণ্ড	ঝাঁসি
১৪)	ব্রজ	সুরসেন (?)	আগ্রা
১৫)	কৌরবি	কুরু	মিরাট
১৬)	পাঞ্চালী	রোহিলখণ্ড	বেরিলি
১৭)	গাড়ওয়ালি	গাড়োয়াল	শ্রীনগর
১৮)	কুর্মচলি	কুমায়ুন	আলমোড়া
১৯)	কৌশলি	কোশল	অযোধ্যা-লক্ষ্ণৌ
২০)	বাৎসি	বৎস	প্রয়াগ
২১)	দেদিক	চেদি	জব্বলপুর
২২)	বাঘেলি	বাঘেলখণ্ড	রেওয়া
২৩)	ছত্তিশ	ছত্তিশগড়	বিলাসপুর
২৪)	কাশীকা	কাশী	বারাণসী
২৫)	মল্লিকা (ভোজপুরি)	মল্ল	ছাপড়া
২৬)	বজ্জিকা	বজ্জি	মজফ্‌ফরপুর
২৭)	মৈথিলি	বিদেহ (ত্রিহুত)	দ্বারভাঙ্গা
২৮)	অঙ্গিকা	অঙ্গ	ভাগলপুর
২৯)	মাগধি(মগহি)	মগধ	পাটনা
৩০)	সাঁওতালি	সাঁওতাল পরগনা	জসিডি

এই তালিকাতে আরও কিছু ভাষা ও জনপদের নাম সংযুক্ত হতে পারে। গ্রিয়ার্সন সাহেব এরকম একটি বিভাজনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রয়াস ছিল প্রারম্ভিক

পর্যায়ে সেজন্য তাঁর করা ভাষাভিত্তিক ক্ষেত্র বিভাজনও ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের। তিনি মল্লিকা এবং কাশীকা দুটি ভাষাকেই ভোজপুরির অন্তর্গত ধরে নিয়েছিলেন, যেটা সঠিক নয়। প্রদেশের বিভাজনের ক্ষেত্রে যেখানে স্ট্যান্ডার্ড ভাষার দাবি আপনার সামনে আসবে তখন কাশী এবং মল্ল জনপদের অধিবাসীরা নিজের নিজের ভাষায় পৃথক উপস্থিতি স্বীকার করে নিতে বাধ্য করবে। প্রদেশের পূর্ণ বিন্যাসের সময় একথা মনে রাখা দরকার যে মল্লবাসীর সংখ্যা ছিল প্রায় সওয়া কোটি। ছাপড়া, বালিয়া, আরা, মেতিহারি, দেওরিয়া, দিলদারনগর ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে তাদের বাস। যেহেতু তাদের অঞ্চল বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে ছড়ানো, সেজন্য তাদের উৎকণ্ঠাও বেশি। তাদের অভিযোগ যে তারা যুক্তপ্রদেশে সঠিক ব্যবহার পায় না, মাতৃভাষার যথাযথ মূল্যায়নও সেখানে হয় না। এখানে না আছে বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যা, না আছে বিশ কোটি জনতাকে সঠিক ভাবে সামলাতে না পারার প্রশ্ন। বিশ কোটি কেন, চল্লিশ কোটি একভাষী মানুষ হলেও, স্রেফ সংখ্যায় বেশি অতএব তাকে খণ্ড খণ্ড করো, এই চিন্তা ভুল। আর বিকেন্দ্রীকরণ? বস্তুত আমরা যা করছি তা তো প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্রীকরণ। যখন আমরা বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে থাকা মল্লিকা-ভাষীদের (ভোজপুরি) এক জনপদে সংগঠিত করার কথা বলি, তখন সেটা তো এক ধরনের কেন্দ্রীকরণই হয়ে দাঁড়ায়।

সমস্ত জনপদের (প্রদেশ) মধ্যে রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটা আন্তপ্রাদেশিক ভাষার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, একথা আমরা আগেও বলেছি। হিন্দি (ফারসি, আরবি শব্দ ভরপুর হয়ে যার নাম হয়েছে উর্দু) বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করছে এবং ভবিষ্যতেও করতে হবে। আমাদের পরামর্শ এই যে, প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্রছাত্রীরা সপ্তাহে দু-তিন ঘণ্টা আবশ্যিক ভাবে হিন্দি শিখুক—উপরে উল্লেখ করা তিরিশটি জনপদের কোনোটিতেই হিন্দিকে তাদের দ্বিতীয় ভাষা বলে মেনে নিতে আপত্তি হবে না; কিন্তু সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষার ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে। বাংলা, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, কেরল, তামিল ইত্যাদি প্রদেশগুলিতে কারও কারও হিন্দিকে আন্তপ্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষা হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে মেনে নিতে আপত্তি থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে আন্তপ্রাদেশিক ভাষা কোন্‌টা হবে তা স্থির করার ভার জনপদগুলির উপরই ছেড়ে দেয়া উচিত। দ্বিতীয় ভাষা রূপে হিন্দির প্রচার ও প্রসার হলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উচ্চজ্ঞানের জন্য হিন্দিতে যে সমস্ত বইপত্র আছে, মাতৃভাষার ছাত্ররাও তার যথার্থ ব্যবহার করতে পারবে। ওই সমস্ত বইপত্র পড়ে পরীক্ষার সময় ছাত্ররা মাতৃভাষায় উত্তর দেবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।

তাহলে কী হিন্দি শুধু মাত্র এক আন্তপ্রাদেশিক ভাষা? এটি তো বেশ কিছু মানুষের মাতৃভাষাও বটে। যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে যারা বাস করে, দৈনন্দিন জীবনে তারা এই ভাষাই ব্যবহার করে। 'মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম' এই মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে মোরাদাবাদ, দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি শহরের হিন্দি ভাষীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা

দেয়ার জন্য ওই সমস্ত জায়গায় হিন্দি মাধ্যমের স্কুল স্থাপন করতে হবে। সোবিয়েত ইউনিয়নেও ওরকম করতে হয়েছে।

একথা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে হিন্দি কেবলমাত্র উল্লিখিত শহরগুলির মুষ্টিমেয় কর্মবিমুখ, ধোপদুরস্ত ব্যক্তিদেরই মাতৃভাষা নয়, শহরের কৃষক,মজুর, কারিগর, মিস্ত্রি ইত্যাদি শ্রেণির মানুষেরও মাতৃভাষা হিন্দি। এই শ্রেণির সংখ্যাও তিরিশ লক্ষের কম হবে না। মিরাট ও সাহারানপুর, মুজফ্ফরনগরের তিন জেলা ও দেরাদুনের নীচের দিকে এবং বুলন্দশরের উপরের দিকে—এই পৌনে চার জেলার গ্রামের জনভাষাও হিন্দি। আপনি ইচ্ছে করলে এই ভাষাকেও 'গ্রামীণদের ভাষা' অ্যাখ্যা দিতে পারেন। এই গ্রামীণ ভাষার সঙ্গে সাহিত্যিক ভাষার অটুট বন্ধন গড়ে ওঠা ততটাই প্রয়োজন, যতটা প্রয়োজন শহরের বাবুদের দৈনন্দিন জীবনে কারিগর, মিস্ত্রি শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি। এবিষয়ে আমরা জার্মান লেখক অ্যালবার্ট শোয়াইটজায়ের নিম্নলিখিত বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে পারি।

"The difference between the two languages (The French and The German) as I feel it, I can best describe by saying that in French I seen to be strolling along the well kept paths in a fine parkf, but in German to be wandering at will in a magnificent forest into literary German there flows continually new life from the dilects with which it has kept in touch. French has lost this ever fresh contact with soil. It is ..... something finished, while German in the same sense reminds something unfinished."

অর্থাৎ ফরাসি ও জার্মান ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য আমরা লক্ষ করি তাকে আমার বন ও উপবনের মধ্যে যে পার্থক্য, সেরকম মনে হয়। ফরাসি ভাষা এমন এক উদ্যান, যেখানে ভ্রমণের জন্য সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি আছে এবং আমাকে সেই নির্দিষ্ট পথেই হাঁটতে হবে এবং সেখান থেকেই উদ্যানের সৌন্দর্যের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু জার্মান ভাষা যেন এক বিশাল অরণ্য, যেখানে ইচ্ছামতো এদিক-ওদিকে যেতে পারি। জার্মানির সাহিত্যিক ভাষা সচেতন, জীবন্ত এবং সতত প্রবহমান, কারণ তার সঙ্গে জার্মানির জনপদগুলির ভাষার নিরবচ্ছিন্ন এক যোগাযোগ বরাবরই ছিল। ফরাসি ভাষার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। তার সঙ্গে ভূমিগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে বহুকাল, আপন শক্তির জোরেই সে পূর্ণতা লাভ করেছে। জার্মান ভাষা কিন্তু এখনও গতিশীল তথাপি অপূর্ণ।

হিন্দিকে তার প্রসবভূমির সঙ্গে সম্পর্ক জুড়তেই হবে। তার নিজস্ব জন্মভূমি (কুরুভূমি) ঊষর নয়, বরং যথেষ্টই উর্বর। কৌরবি ভাষার কাছে না পৌঁছলে তার কৃত্রিমতার দোষও দূর হবে না এবং সংস্কৃত আর আরবি থেকে শব্দ ধার করার একটা যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় তা থেকেও সে উদ্ধার পাবে না। হিন্দিকে আমজনতার কাছে সহজভাবে যাতে প্রকাশ করা যায়, তার জন্য আমাদের হাতুড়ে চিকিৎসকেরা যে সমস্ত বিধান দিয়ে থাকেন তার অর্থ হল, কিছু আরবি ও ফারসি শব্দ হিন্দির মধ্যে জোর করে হলেও ঢোকানো হোক। হিন্দিকে উর্দুর দিকে ঠেলে দিলে কিংবা উর্দুকে জোর করে হিন্দির কাছে টেনে আনলে,

ভাষা সহজ সরল হয়ে উঠবে না। দুটো ভাষাকেই সহজ সরল করার একটিই উপায়—সেটি হল তার জননীভাষা অর্থাৎ কৌরবি ভাষার কাছে নিয়ে যাওয়া। অখণ্ড হিন্দিবাদীদেরও মানতে হবে যে আজ হিন্দি যে জায়গাতে গিয়ে পৌঁছেছে, সেখান থেকে তাকে মূলস্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ না করলে তার মধ্যে যে অপূর্ণ অবলোকন শক্তি এবং পূর্ণরূপে ভাব প্রকাশের অক্ষমতা থেকে গিয়েছে, তাকে দূর করা সম্ভব হবে না। আজ মাঝি, মাল্লা, লোহার, কুমোর ইত্যাদিদের হাতিয়ার এবং কর্মকাণ্ডের বিষয় কেন আমাদের উপন্যাসে কিংবা কাহিনিতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না? এর কারণ, হিন্দি তার মূল স্রোতের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে এবং ভাষা এখন রক্তাল্পতা রোগে ভুগছে। হিন্দির এই করুণাপ্রার্থী, দরিদ্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে তখনই, যখন সে তার জন্মভূমির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করবে।

আমার তো মনে হয় হিন্দি ভাষার জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে কৌরবির অলিখিত গীত, কবিতা, কাহিনি, প্রবচন, প্রবাদ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত নমুনা সংগৃহীত হোক। হিন্দি ভাষায় উপন্যাসকার ও কাহিনিকারদের মধ্যে যারা সামাজিক জীবনের চিত্র আঁকতে উৎসাহী, তারা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোনো গ্রামে গিয়ে মাস খানেকের জন্য বাস করুক এবং এটাকে তাদের শিক্ষার অন্যতম বিষয় মনে করুক।

মাতৃভাষাকে তার যথার্থ অধিকার দিলেই হিন্দি উর্দুর সমস্যা একেবারেই নিরর্থক হয়ে পড়বে যে ভাবে বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্নে উর্দু একেবারেই নিরর্থক প্রমাণিত হয়েছে।

পুনশ্চ:

আজমগড়ের শ্রী পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত একজন তরুণ সাহিত্যিক, তিনি তাঁর প্রতিবেশী নিরক্ষর এক কবি বিশ্রাম-এর কাব্যগ্রন্থ (বিরহ) বিষয়ে, 'বিশাল ভারত' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ওই কবি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে চেয়ে শ্রীগুপ্তকে চিঠি লিখি এবং তার উত্তরে তিনি লিখেছেন—'বিশ্রামের লেখাপড়া সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল যে তাঁর অক্ষর জ্ঞান নেই। এই প্রদেশে বিশ্রামের মতো আরও অনেক কবি কত না বিরহ রচনা করেছেন এবং যেগুলি যে কোনো মহাকবির রচনার সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য, কিন্তু এঁদের অধিকাংশই অজ্ঞাত এবং উপেক্ষিত। আমি এই বিষয়ে কিছু কাজ করছি। 'শুকদূত', 'দয়ারাম', 'বনজারা', 'চনৈনি' ইত্যাদি কিছু কাব্য ও মহাবাক্যের খোঁজ পেয়েছি যেগুলি বিরহী গায়কদের মুখে মুখে ফেরে। সেগুলিকে সংগ্রহ করে সংকলিত করা খুবই ব্যয়সাধ্য এবং পরিশ্রমের কাজ। তবে আমি যে করেই হোক এই কাজটা শেষ করব। কিন্তু তারপর প্রকাশনা? এখানেই মস্ত বড়ো এক প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাকে। মহাকাব্যগুলি এক একটা আড়াইশো তিনশো পৃষ্ঠার কম হবে না, তারপর ভূমিকা, ব্যাখ্যা, টীকা ইত্যাদি নিয়ে কলেবর আরও বাড়বে। এরকম বিশালরচনা সম্ভারের প্রকাশনার দুঃসহাস বর্তমানে কে দেখাতে পারে? এমনিতে এই বিষয় নিয়ে আমি ছোটোখাটো কিছু

প্রবন্ধাদি লিখেছি এবং লিখব। কিন্তু ওই রচনাগুলি মুদ্রিত হয়ে পৃথিবীর আলো না দেখলে ভোজপুরি কিংবা মল্লিকা ভাষার সাহিত্যের বন্ধ্যাদশা কী করে ঘুচবে? বর্তমানে শহুরে লোকেরা এই সব সাহিত্যকে মনে করে প্রাণহীণ, গ্রাম্য ইত্যাদি। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

পরমেশ্বরী বাবুর এই চিঠিটি আমাকে কতগুলি প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে এবং প্রশ্নগুলি হিন্দিসাহিত্য বিষয়ে নয়, মাতৃভাষার সাহিত্য বিষয়ে। কাশীকা (সম্পূর্ণ বারাণসী তথা মির্জাপুর, জৌনপুর এবং আজমগড়ের অনেক অঞ্চলে মানুষের কথ্য ভাষা), ভোজপুরি (মল্লিকা), অবধি, বুন্দেলি ইত্যাদি ভাষাকে গ্রামীণ ভাষা অ্যাখ্যা দেয়া থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে জনসাধারণ এই ভাষাগুলির মহত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নয়। 'গ্রামীণ' বলার অর্থ অসভ্য, অসংস্কৃত, অন্তঃসারশূন্য করুণাপ্রার্থী ভিক্ষুক ভাষা। শুধুমাত্র মাতৃভাষাতেই কথা বলতে কিংবা বুঝতে পারে, এরকম কোনো লোকের সঙ্গে আমাদের শহুরে শিক্ষিত বাবুদের সাক্ষাৎ হলেও তাদের মনে ওরকম মনোভাবেরই জন্ম হয়। আমাদের অনেক উৎসাহী সাহিত্যিক, গবেষক অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই সমস্ত গ্রামীণ মাতৃভাষায় রচিত গীত ইত্যাদি সংগ্রহ করেছেন বা করছেন, কিন্তু এই ভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে যে এই সমস্ত গ্রামীণ অজ্ঞাত, অসংস্কৃত কাব্যকে বিনষ্ট হতে দেয়া হবে না। এই মনোভাব অনেকটা সেরকম ধরনেরই যেরকম অনেক মানবতত্ত্বশাস্ত্রী মনে করেন যে পশ্চাদপদ আরণ্যক জাতিগুলিকে পৃথক কোনো জনপদে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হোক। তাঁরা ভুলে যান যে এই ভাষাগুলি মৃত নয় বরং বিশেষভাবে জীবিত, তবে অধিকারচ্যুত, মর্যাদা বঞ্চিত শোষকদের হাত থেকে যেদিন জনতা রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেবে, তারপরই দেখবেন এই ভাষাগুলিকে কত জীবিত, নাগরিক, সংস্কৃত এবং সুললিত মনে হবে। জনতার বর্তমান এই পরতন্ত্রতাকে যারা মনে করে চিরকালীন তারা একদল নৈরাশ্যবাদী তাদের দ্বারা সংগ্রহশালা কিংবা মিউজিয়াম নির্মাণের বেশি আর কিছু সম্ভব নয়।

নৈরাশ্যবাদীরা মনে করে, যে ভাষা মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তার কাছ থেকে যত তাড়াতাড়ি এবং যত বেশি পরিমাণে সম্ভব সম্পদ আহরণ করে নিতে হবে। মূল কারণ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ওখান থেকে যতটুকু পাওয়া যায় তাই লাভ। সংগ্রহের জন্য বেশি সময় দিলে চলবে না, কারণ ভাষাটি মরতে চলেছে। কিন্তু এই ভাষাদেরও দিন আসছে। এদের ব্যবহার না করলে শতকরা একশো ভাগ জনতাকে পাঁচ বছরের মধ্যে স্বাক্ষর কিংবা শিক্ষিত করে তোলার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কোনো স্বাধীন এবং বুদ্ধিমান জাতি বিদেশি ভাষায় জ্ঞানলাভকে বাধ্যতামূলক করে না। মাফ করবেন, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে যে হিন্দিও অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা নয়, শিখে নেয়া ভাষা এবং এই আরোপিত ভাষায় শিক্ষা লাভের ফলে বহু বিহারি ছাত্রকে দেখেছি চোদ্দো বছর স্কুল-কলেজে কাটিয়েও ব্যাকরণে তাদের ব্যুৎপত্তি জন্মায় না। সোবিয়েত মধ্য এশিয়ার 'উজবেক', 'তাজিক', 'তুর্কমেনি', 'কিরঘিজি' ইত্যাদি মাতৃভাষা জনগণ ও সরকারের আনুকূল্য পেয়ে আজ

সাহিত্যের ভাষাতে পরিণত হয়েছে এবং সমস্ত বিষয়েই অভূতপূর্ব উন্নতি করে আমাদের সামনে জ্বলন্ত এক উদাহরণ উপস্থিত করেছে।

অবশ্য এ ব্যাপারে 'অখণ্ড যুক্তপ্রদেশ' এবং 'অখণ্ড বিহার' এই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থা মেনে নেয়ার পরিণাম? সমগ্র জনতাকে কখনোই অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিত হতে না দেয়া। ফলস্বরূপ অধিকাংশ মানুষ 'নাগরিক' অধিকার বঞ্চিত 'গ্রামীণ' হয়ে থাকুক এবং নানা ধরনের জোঁক জাতীয় পরজীবীরা জনগণের নামেই জনগণের ওপরে শোষণ চালিয়ে যাক। এক ভাষাভাষীদের আলাদা প্রদেশ যেন গড়ে না ওঠে, যার ফলে অভ্যন্তরীণ বিবাদ চিরস্থায়ী হবে। কোনো অবস্থাতেই এই পরিস্থিতি মেনে নেয়া চলে না। ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেরও প্রকৃত স্বাধীনতা এই সব ভাষাগুলির পক্ষ থেকেও কাম্য, কারণ তারপরই এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেতে পারে— মল্লিকা (ভোজপুরি) ভাষাভাষী আরা, ছাপড়া, মতিহারি সম্পূর্ণ বালিয়া তথা গোরখপুর, আজমগড় এবং গাজিপুর জেলার বিস্তৃত অঞ্চলকে ধরে স্বতন্ত্র এক মল্ল প্রদেশ গঠিত হোক; কাশীকা ভাষাভাষী অঞ্চলকে নিয়ে কাশী প্রদেশ বা প্রজাতন্ত্র গঠিত হোক। যদি এর ফলে সর্বত্র অখণ্ড বিহারের ধ্বনি, যুক্তি এবং ন্যায়ের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে জনগণকে বোঝাতে হবে যে ওই ধ্বনি অধিকাংশ বিহারবাসীদের স্বার্থের প্রতিকূল। এর দ্বারা বিহারিদের তো বটেই সমগ্র দেশেরও কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না এবং এই ধরনের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করাই জনতার পক্ষে মঙ্গলের।

এর পরের প্রশ্ন হিন্দি। হিন্দিকে আমরা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা বলে স্বীকার করতে পারি, কিন্তু সে আমাদের মাতৃভাষা নয়। আর কোনো অবস্থাতেই মাতৃভাষাকে বধ করে পুতনা হবার সাধ আমাদের নেই। হিন্দি ভাষাকে শুধু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের কষ্টিপাথরে বিচার করলে ভুল হবে। মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিলেও জনতার যুগে হিন্দি তার প্রকৃত মর্যাদা হারাবে না। মাতৃভাষার বিকাশের ফলে হিন্দির হয়তো এখনকার মতো অত রমরমা থাকবে না, নাই বা থাকল, জনকল্যাণের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে আমাদের সেরকম অবস্থা মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়?

গুপ্তজি তাঁর পত্রে বিশ্রামের মতো বিস্মৃত কবিদের জন্য খেদ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে ভুল হওয়া উচিত নয় যে তাঁদের রচিত কবিতা ইত্যাদি একেবারে বিফলে গেছে। যদি তাঁদের কবিতা বাস্তবিকই কবিতা হয়ে থাকে তাহলে তা নিশ্চয়ই অনেক হৃদয়কে ইতিমধ্যে সংস্কৃত করেছে এবং এরকম পরিবেশের মধ্যেই বিশ্রামর মতো কবিদের জন্ম হয়েছে এবং হবে। এখন যেহেতু বইপত্র ছাপার ব্যবস্থা হয়েছে অতএব আমরা মনে করছি যে এবার এসব চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু যখন এই সমস্ত বইপত্রকে আগামী দশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করি, তখন মনে হয়, আজ বহুল প্রচারিত, এমন অনেক নাম সেদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে না। সেরকম পরিস্থিতিতে পুরানো বিশ্রামের জন্য এত চিন্তার কি প্রয়োজন? যে অনামা কাব্যস্রোতের ধারায় বিশ্রামের জন্ম হয়েছে

সেই স্রোত কখনও বন্ধ হবে না। বিশ্রামের মতো কবিরা যে ভাষাকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয়েছেন সেই ভাষা কোনোদিন বন্ধ্যা হবে না।

গুপ্তজি, তাঁর সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, তার উল্লেখ করেছেন। এর জন্যও সেই একই কথা বলতে হচ্ছে, পুঁটলি আর শোষণের রাজত্বের অবসান করুন দেখবেন এই সমস্ত বাধা আর নেই। দাগেস্তানের নিরক্ষর কবি সুলেমান স্তালস্কিকে অন্যতম বিশ্বকবির আসনে বসিয়েছে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব। যদি তার উপরে আস্থা না থাকে, তাহলে আপনার এলাকার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে বলুন এই সংকলন প্রকাশ করে একে তাদের শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্গত করতে, অন্যথায় আগুন লাগিয়ে দিন ওই অফিসে, ওই অনাবশ্যক সংস্থা থাকলেই বা কী, আর না থাকলেই বা কী।

মাতৃভাষার উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকদের আমার পরামর্শ যে একে আপনারা অনাথ ভাববেন না। মনে রাখবেন, ভবিষ্যৎ এদেরই। সংগ্রহের কাজ খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। সংগ্রহ করে তার দুটি প্রতিলিপি তৈরি করুন। প্রতিলিপি তৈরির সময়, ওই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে এমন লোকের সহযোগিতা নিলে লাভই হবে। একটি প্রতিলিপি পাঠান ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিসে এবং তাদের বলুন ওটিকে প্রকাশ করতে। না করলে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, মশাল মিছিল ইত্যাদি সংগঠিত করুন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সংস্কার করতে হবে নয় তাকে ধ্বংস করে দিতে হবে।

প্রগতিশীলতার প্রশ্ন

প্রগতি সাহিত্য, যখন তার কপালে জুটত উপেক্ষা আর অবহেলা আজ সে তার সেই অবস্থা কাটিয়ে উঠে এগিয়ে যেতে পেরেছে। তার চেয়েও বড়ো কথা তার সম্বন্ধে ক্রূর মৌনতা অবলম্বন করে আঁতুড় ঘরেই তাকে গলা টিপে মারার চেষ্টাও করা হয়েছিল। এই পক্রিয়ায় প্রগতি সাহিত্যকে ধ্বংস করা সম্ভব না হওয়ায় আজ প্রগতি বিরোধীরা তাদের সযত্নে লালিত মৌনতা ত্যাগ করে প্রকাশ্য বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। এই বিরোধিতা প্রধানত আসছে শিকড়হীন এক গোষ্ঠী থেকে এবং সম্পূর্ণ বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে (এতদসত্ত্বেও কিছু দোষারোপের প্রতি প্রগতিশীল সাহিত্যিকদেরও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যাতে আমরা নিজেদের ত্রুটি, দুর্বলতা শুধরে নিতে পারি)। কিছু সমীক্ষকের মতে প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের অধ্যয়ন এবং চিন্তনের কোনো গভীরতা নেই, তারা শুধু স্লোগানকে সঙ্গী করে উড়তে চায়। অধ্যয়ন ও চিন্তন বিষয়ে অগভীরতার অভিযোগ হিন্দির অন্য বিচার ধারার সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আরও অনেক বেশি করা যেতে পারে। কিন্তু প্রগতিশীলেরা নিশ্চই সেই অজুহাত দিয়ে তাদের প্রতি দোষারোপকে খণ্ডন করতে যাবে না। প্রগতিশীল সেই হতে পারে যে আজ থেকে পঞ্চাশ-একশো বছর আগে নয়, এমনকি পাঁচ-দশ বছর নয়, আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত যা কিছু মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে বা করছে, সে সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত আছে। এই কাজ অবশ্যই কঠিন। প্রগতিশীলতার পথ স্থিতিশীল —স্থির— নয়, বরং গতিশীল। এপথের পথিক, পথ এবং পরিস্থিতি প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, এরকম অবস্থায় পথিকের কাজ যে কত কঠিন তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। সেজন্য স্থির পথের অনুগামী সাহিত্যিকদের ছায়ার আড়ালে প্রগতিশীল সাহিত্যিক নিজেকে লুকোতে পারে না। প্রগতিশীলতা জীবনের প্রতিটি বিষয়ের—জ্ঞান ও কর্ম—সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। এবং সে সম্বন্ধে প্রগতিশীলেরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাখে। অনেক সময়ে এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে প্রগতিশীলতা প্রচুর বাধার সম্মুখীন হয়েছে। তবে দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে তা হোক আরও গতিশীল, স্থিতিশীল নয়।

অনেকে প্রগতিশীলদের প্রতি এই অভিযোগ করেন যে তারা সব কিছুকেই ধ্বংস প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করতে তৎপর। তারা সমস্ত কিছুরই এই ব্যাখ্যা হাজির করে যার ফলে মনে হতে পারে যে প্রগতিশীলতা যেন মা বাবা ব্যতিরেকেই অকস্মাৎ শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে। প্রগতিশীলতা কখনোই নিজেকে তার শিকড় থেকে, তার পূর্বগামী সংস্কৃতির সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। যদি কেউ প্রগতিশীলতার নামে আমাদের অমর স্রষ্টা—বাল্মীকি, অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি, বান, সরহপা, জায়সি, সুর, তুলসী থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের প্রেমচাঁদ, প্রসাদ পর্যন্ত—যে পরম্পরা চলে আসছে,

তা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়াকে সঠিক বলে মনে করে, তাহলে তিনি আর যাই হোন, প্রগতিশীল নন। এঙ্গেলস জার্মান অধ্যাপক ড্যুরিং-এর এই ধরনের উদ্ভট ধ্যান-ধারণার বিরোধিতা করে বলেছিলেন— এরপর হয়তো মহাকবি গ্যেটেকে ধ্বংস করা হবে, কারণ তিনি ড্যুরিং-এর 'সমাজবাদী' যুগে জন্মাননি আবার ড্যুরিং-এর পক্ষেও তাঁর যুগে আর-একটি গ্যেটের সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষেও আমাদের নিজস্ব গ্যেটে, ভার্জিল, সেক্সপীয়ার আছেন, প্রগতিশীলতার নামে তাঁদের মর্যাদা হানি কিংবা স্থানচ্যুত করার চেষ্টা নেহাতই বালখিল্যতা কিংবা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রগতিশীলরা তো এটাই চায় যে, যে সমস্ত অমর স্রষ্টাদের দেশের জনতা এখনও অনেক কম জানে, সেই খামতিকে দূর করে, যথাবিহিত মর্যাদার সঙ্গে তাঁদের জনগণের হৃদয়ে কী ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। রাশিয়াতে প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা এরকম করে দেখিয়েছেন। সেক্সপীয়ার শুধু ইংলন্ডে নন, সারা বিশ্বের এক মহান নাট্যকার। তাঁর জন্ম ত্রিশত-বার্ষিকীতে, এই মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও সোবিয়েত ইউনিয়ন যে ভাবে উৎসব পালন করেছে, সে তুলনায় তাঁর জন্মভূমি ইংলন্ডে তাঁকে সে ভাবে স্মরণ করাই হয়নি। এই উদাহরণই প্রমাণ করে যে প্রাচীন সংস্কৃতির আলোকস্তম্ভ স্বরূপ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রগতিশীলদের মনোভাব কীরকম হওয়া উচিত। স্তালিনগ্রাদ শহরে সেক্সপীয়ারের নামে একটি দীর্ঘ রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের মহান গৌরব কালিদাস এবং তাঁর অদ্বিতীয় রচনা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম'-কে সোবিয়েতের প্রগতিশীল সমাজ এত সম্মান দিয়েছে তা একটি ঘটনা থেকেই প্রমাণ হবে। কয়েক বছর আগে অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকটিকে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ নিয়ে বিখ্যাত এক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা হয়। এখন কেবল একটি নয়, তিন তিনটি রুশ অনুবাদ রয়েছে এবং সোবিয়েত জনগণের মধ্যে এই নাটকটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছে। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনা সোবিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই যুদ্ধের সময়েও সোবিয়েত বিদ্বজনেরা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম আকর গ্রন্থ মহাভারতের বিশাল এক প্রামাণ্য অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে তাঁরা প্রাচীন যুগের মহাভারতকে ধুলোবালি কিংবা আবর্জনা বলে মনে করেন না। সোজা কথা, প্রকৃত প্রগতিশীলতা থেকে আমাদের মহান সংস্কৃতির গৌরবের কোনো হানি হতে পারে না। যে ভাবে আমাদের শরীরের জীবকোষ (cell) নিজের ক্রোমজোমের মধ্যে কয়েকশো পুরুষ ধরে এক পরম্পরা, কর্মক্ষমতাকে ধরে রাখে, এগিয়ে নিয়ে যায় সেই ভাবে আমাদের সমস্ত মানসিক ক্ষমতাও প্রাচীন সংস্কৃতি ও কলার কাছে দায়বদ্ধ। একথার অর্থ এই নয় যে পরম্পরা আমাদের কাছে সদর্থক ভাবনার সঙ্গে কিছু নঞর্থক ভাবনা, দুর্বলতা, ব্যাধি ইত্যাদি এনেছে তাকে দূর করার চেষ্টা করব না। যে পরম্পরা আমরা এখন বয়ে নিয়ে চলেছি তার মধ্যে ভালো এবং মন্দ দুটিই আমাদের পরম্পরা সূত্রেই পাওয়া। যা কিছু মহৎ, চিরন্তন, মানুষের পক্ষে তাকে ধরে রাখতে হবে আর যা দুর্বলতা, হানিকারক তাকে দূর করতে হবে। জীবনের জন্য, গতির জন্য আমাদের

এই প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। প্রগতিশীলতাকে আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখতে হবে। তারা হেগেলকে সম্মান করবে কারণ হেগেলও একজন মহান দার্শনিক ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের দেশের ধর্মকীর্তিকেও ভুলে গেলে চলবে না। যিনি জার্মান দার্শনিক হেগেলের জন্মের বারশো বছর আগে জন্মগ্রহণ করেও বহু বিষয়ে হেগেলের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলা যায় বিশ্বের জ্ঞানীমণ্ডলীদের কাছে দিঙনাগ, ধর্মকীর্তির দার্শনিক বিচার চিরকাল উচ্চাসনে বিরাজ করবে। বুদ্ধ, চার্বাক, কণাদ, অক্ষপাদ প্রভৃতি দার্শনিককে আমাদের প্রগতিশীলেরা কখনোই ভুলবে না— বিস্ময়ের কথা এই যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এদের ভোলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। সংস্কৃত ভাষার জন্য প্রায় জীবন উৎসর্গীকৃত আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলীও শব্দের পিছনে এতটাই ব্যগ্র, যে দর্শনশাস্ত্রে যে সমস্ত প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞানীরা বিশাল অবদান রেখে গেছেন তাঁদের যথাবিহিত গুরুত্ব দিতে বড়োই কুণ্ঠিত। বস্তুত আমরা আমাদের মহান বিচারকদের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারিনি। বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে তাঁদের অবদানকে যথার্থ ভাবে তুলে ধরিনি। আমাদের প্রগতিশীলতা শংকরাচার্য পর্যন্ত পৌঁছে দর্শনকে ধ্বংস করার পথ নিতে পারে না, তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলার দায়িত্ব কিন্তু তার— উপযুক্ত পুত্রের সেটাই কর্তব্য যে পৈত্রিক সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এই একই কথা চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ভারতের মনীষীরা এই সব ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছেন তা গ্রিক ও আরবি অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তাকে আমাদের নিজস্ব গৌরব মনে করতে হবে। আমরা জানি যে এই গৌরবকে সকলে এখনও স্বীকৃতি দেয়নি। হতে পারে আমাদের রাজনৈতিক পরাধীনতাই এর অন্যতম কারণ, আবার সেই সঙ্গে আমাদের অজ্ঞতাজনিত সেই দোষও যথেষ্ট কারণ যেখানে পূর্বজদের সমস্ত কিছুরই অন্ধ সমর্থন করার বিষয়টি আমাদের প্রবৃত্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

সংক্ষেপে, আমাদের সামানে যে পথ রয়েছে তার কিছুটা অংশ ইতিমধ্যে আমরা অতিক্রম করে এসেছি এবং বাকি অংশটুকুও আমাদের অতিক্রম করতে হবে। ফেলে আসা সময় থেকে আমরা সহায়তা নেব যা আমাদের আত্মবিশ্বাস অর্জনে সহায়ক হবে, কিন্তু সেদিকেই আবার চলতে শুরু করার নাম প্রগতিশীলতা নয়, প্রতিক্রিয়াশীলতা। আমরা সম্পূর্ণ ভাবে অতীতে ফিরতে পারি না, কারণ অতীতকে বর্তমানের রূপ দেবার অধিকার প্রকৃতি আমাদের হাতে দেয়নি। আজ, এই মুহূর্তে, আমাদের সামনে যে কর্মপথ একমাত্র তাতেই অটল থাকব, এমন ভাবনা হয়তো প্রতিক্রিয়াশীল নয়, কিন্তু প্রগতিশীলও বলা যায় না। তাকে বলতে পারি সহগতি। কোনো রকমে পথচলা, এর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন নেই, নিছক গড্ডালিকা প্রবাহ। ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলা কাঠের টুকরোর মধ্যে প্রাণ আছে একথা বলা যেমন নিরর্থক, তেমনই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার জন্য, চেতনা সম্পন্ন সমাজের একজন সদস্য হওয়ার সুবাদে আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন স্রোতে ভেসে চলা

কাষ্ঠখণ্ডের মতো হয়ে না পড়ি। আমাদের অতীত এবং বর্তমানকে তারই আলোকে ভবিষ্যৎ পথের জন্য সুগম করি, যাতে আমাদের অনাগত বংশধরদের চলার পথ আরও সহজ সরল হয় এবং তারা আমাদের অভিসম্পাত না করে যেন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। হিন্দি সাহিত্যে এই শতাব্দীতেই যখন কবিতার ভাষা কী হবে এই প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল, তখন অনেকেই ফতোয়া জারি করে বলেছিলেন যে খড়িবুলি কখনোই কবিতার ভাষা হতে পারে না। তাঁরা অতীত যুগের কোনো ভাষাকে এই শতাব্দীতেও কবিতার ভাষারূপে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এটা ছিল কবিতার ক্ষেত্রে এক প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপ, তবে সৌভাগ্য আমাদের এই অবিমৃষ্যকারিতা বেশি দিন টিকে থাকেনি। এরপরেই ভাষার প্রশ্নে প্রগতিশীল মতামত স্বীকৃতি পেতে থাকে কিন্তু ভাবের প্রশ্নে তখনও কেবল তাৎক্ষণিক রুচি ও উদ্দেশ্যকেই প্রাধান্য দিয়ে কবিতা রচনা চলতে থাকে। এই সব কবিতা একদা জনপ্রিয় হলেও প্রগতির অন্তরায় ছিল এবং কালের নিয়মে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারল না। এই ব্যর্থতার পরই প্রগতিবিরোধীরা খানিকটা হাল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আসে এবং পন্থ, প্রসাদ, নিরালার মতো প্রগতিবাদী কবিরা সেই শূন্যস্থান সহজেই অধিকার করে নিলেন। এঁদের কবিতায় ভাষা, ভাব সবকিছুর মধ্যেই এক নব-নির্মাণের ছাপ আছে, যাকে বলা যায় জীবন। প্রগতির পথে অনেক বাধা আছে। এই পথে চলা আরম্ভ করলে আর থামা চলে না, অবিরাম শুধু চরৈবেতি আর চরৈবেতি। ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য থামলেই পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা। যদি চলতে চলতে এক প্রজন্ম ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁদের ভাবতে হবে প্রগতির ইজারা একমাত্র তাঁদের উপরেই নেই যার জোরে তাঁরা যখন খুশি থামবেন আবার যখন খুশি চলবেন। প্রগতিপথের যাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলে কেউ তাঁদের মনে রাখবে না, পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের স্থান গ্রহণের জন্য তৈরি।

প্রগতিশীল লেখকদের সম্বন্ধে আর-একটি অক্ষেপ খুবই প্রচলিত। এঁরা সাহিত্যে নগ্নতা, অশ্লীলতা এবং যৌন দুরাচারকে তাঁদের বিষয়বস্তু করেন। সত্যি সত্যি যদি কোনো লেখক এরকম করেন তাহলে বলতে হবে যে খুবই দায়িত্বজ্ঞান হীনতার পরিচয় এবং তাঁকে প্রগতিশীল অ্যাখ্যা দেয়া চলে না। প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের এটা মনে রাখা দরকার যে তাঁরা পৃথিবীর ব্যাখ্যা করার জন্য কলম ধরেননি, কিংবা তার দুঃখে কাতর হয়ে দুফোঁটা অশ্রু বিসর্জন, দু-চার পৃষ্ঠা জ্বালাময়ী বিশ্লেষণ করলেই তাঁদের কর্তব্য শেষ। যদি পায়ের নীচের জমি শক্ত থাকে, বিষয়বস্তু নিরাকার না হয়ে এই মাটির পৃথিবী থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে সেই লেখা কখনোই উদ্দেশ্যহীন হবে না বরং তার মধ্যে একটা মহৎ লক্ষ্য থাকবে। আমরা সমাজকে যেমন অবস্থায় পেয়েছি, তাকে আরও সুন্দর করে আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে হবে। এরকম একটা গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় যিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তিনি কখনোই যৌন দুরাচার জাতীয় চটুল বিষয়ের পিছনে ছুটে তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারেন না। মানবজীবনে যৌন সম্বন্ধেরও একটা স্থান আছে, যদি একে অস্বীকার করি তাহলে প্রথভ্রষ্ট হয়ে আরেকটি 'অতি'তে গিয়ে পৌঁছাব এবং

সেই ভাবনা থেকে যা কিছু সৃষ্টি হবে তা হবে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এক বস্তু। এজন্য কখনোই বলব না যে আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে নারীপুরুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা আদৌ আসবে না। প্রয়োজন হলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু তাকেই প্রধান উপজীব্য করে, আজ সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে সৃষ্টি হওয়া মানুষের ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে মূলধন করে ফায়দা তোলার চেষ্টাকে কখনোই সঠিক বলা যাবে না। বস্তুত পক্ষে এরকম তাঁরাই করেন যাঁদের লেখনী দুর্বল এবং বিষয়বস্তুও খুবই হালকা।

প্রগতিশীল সাহিত্য, প্রগতিশীল বিশ্বেরই এক অঙ্গ। শিল্প, কাব্য, সংগীত, সাহিত্য একসময় মুষ্টিমেয় কিছু লোকের উপভোগের সামগ্রী ছিল, বড়ো বড়ো সামন্ত—রাজা এবং পুরোহিত— এরাই তা থেকে মনোরঞ্জন করত। পুঁজিবাদী যুগে যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বই, চলচ্চিত্র, রেকর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে ওই সব বিষয়গুলি সমাজের বিভিন্ন অংশে পৌঁছতে সমর্থ হয়, কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও কলাপ্রেমীদের জমায়েত কিছু নির্ধারিত মানুষের সমাবেশ হয়েই থেকে গেছে। এই নাক উঁচু মানুষেরা মনে করে সাহিত্য-সংস্কৃতির তারাই জনক এবং এবিষয়ে তারা যা বলবে সেটাই শেষ কথা এবং সর্বজনগ্রাহ্য। সাধারণ মানুষকে এরা সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশুর স্তরেই রাখতে চায়। সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কখনোই একথা মনে হয়নি যে সাহিত্য-সংস্কৃতির স্রষ্টা তারা নয়। যেমন নয় মাঠের গম কিংবা কারখানায় উৎপাদিত বস্ত্রের। তবে সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নষ্ট করার জন্য তারা অবশ্যই। এবার সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধ্বনি, অলংকার ইত্যাদি যে দৃষ্টিতেই ভাষাকে দেখা যাক না কেন, তাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ভাষা নির্জীব, যান্ত্রিকভাবে কিংবা সরাসরি অনুবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত শব্দের সাহায্যে ভাষাকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে পারে না। মানুষের মনের মধ্যে তরঙ্গায়িত ভাব বহিঃপ্রকাশের জন্য শব্দের সন্ধান করতে থাকে। ভাব প্রকাশে বিলম্ব ঘটার অন্যতম কারণ সঠিক সময়ে সঠিক শব্দ খুঁজে না পাওয়া। যে সমস্ত শব্দ বহুদূর পর্যন্ত ধ্বনিত হয় সেই সব শব্দে গঠিত বাক্য ভাষাকে অনেক বেশি সহজ করে ব্যক্ত করতে পারে। আর শব্দের মধ্যে ওই ক্ষমতা তখনই আসতে পারে যখন সে নির্জীব, নিছক শব্দের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে ওঠে। এই সমস্ত প্রবাদ-প্রবচনের দিকে আপনি যদি একটু মনোযোগ দেন, তাহলে দেখবেন একশোটির মধ্যে নিরানব্বইটি প্রবচনের স্রষ্টা ওই তথাকথিত ধোপদুরস্ত বাবুরা নয়, সাধারণ মানুষ। তারাই 'জোর যার মুলুক তার', 'ঢাকের বাদ্যি থামলে মিঠে', 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' এই জাতীয় হাজার হাজার প্রবচন সৃষ্টি করে ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। চোখ বুজে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি থেকে হাজার খানেক শব্দ ধার করার পরও আমাদের হিন্দি এবং উর্দু, ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে যে দৈন্যদশা প্রকট করে, তার একটা বড়ো কারণ হল, জনতার তৈরি এই সব প্রবাদ-প্রবচনকে ভাষার মধ্যে ঢুকতে না দেয়া। ওইসব প্রবাদ-প্রবচন থেকে বঞ্চিত হতে না চাইলে হিন্দিকে (এবং উর্দুকেও) তাদের আকাশচারিতা থেকে নীচে নামতে হবে

এবং তার জননী-ভাষা কৌরবির (মিরাট কমিশনারির পৌনে চার জেলার স্থানীয় ভাষা) সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। ধোপদুরস্ত ভদ্রলোকেরা তখনই বুঝতে পারবেন যে জনতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেই ভাষায় সমৃদ্ধি আসে, বিচ্ছিন্ন হলে নয়।

সংগীত সম্বন্ধে বোধহয় এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে এটির জন্ম সমুদ্রগুপ্ত কিংবা আকবরের দরবারে। কিন্তু এখানেও একটু অনুসন্ধান চালালেই দেখতে পাব যে ঘটনা ঠিক এর বিপরীত। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে কর্ম বিমুখ— সামন্ত, পুরোহিত, শেঠ, মহাজন—এরা কোনো সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির জনক হতে পারে না, তবে হন্তারক অবশ্যই হতে পারে। সমুদ্রগুপ্তর সময়ে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সংগীত বিষয়ে কোনো তানসেন কিংবা হরিদাসের জন্ম হয়েছিল। বলা যায় না যে এই তানসেন সামন্ত, পুরোহিত, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদি জাতীয় তথাকথিত কোনো ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছিল নাকি সাধারণ জনতার ঘরে। অস্বাভাবিক ভাবে মেজেঘষে প্রতিভা তৈরির প্রয়াস ওই তথাকথিত ভদ্রবংশে বেশি দেখা যায় তবে প্রতিভার স্ফুরন সাধারণ মানুষের ঘরে জন্মালেও দেখা যেতে পারে। যাইহোক, সমুদ্রগুপ্তর দরবারের এই তানসেন হয়তো সাধারণ মানুষের জীবনের গীত-সংগীত, তার তাল-লয়ের সঙ্গে ভালোমতোই পরিচিত ছিল। সে হয়তো মৌর্যযুগ কিংবা তারও আগে থেকে চলে আসা দরবারি গীত তালকে সমুদ্রগুপ্ত কিংবা তাঁর পিতার দরবারে শুনেছিল। সে তার সংগীত প্রতিভাকে নিজের চারপাশের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাগরাগিনীকে খোঁজার কাজে ব্যাপৃত রেখেছিল এবং সেখান থেকেই সে এক নতুন ধারার সংগীতের সৃষ্টি করে যার আরোহ-অবরোহ তৎকালীন কবি কালিদাসের কাব্য, অজন্তার গুহাচিত্র কিংবা উদয়গিরির ভাস্কর্যের মতোই সুসংস্কৃত ছিল। কিন্তু সেই যুগে সেই সংগীতকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাবার কোনো মাধ্যম ছিল না। ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে এবং এই যুগের সর্বোতমুখী উন্নতির পরিবেশে সংগীতের উন্নতিও নিশ্চয়ই পিছিয়ে ছিল না। হতে পারে সমুদ্রগুপ্তর দরবারের তানসেন এবং অন্য সহযোগীদের সৃষ্ট সংগীতে তাদের অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে গিয়ে পৌঁছেছিল, যারা নিজেদেরকেই সেই সংগীতের স্রষ্টা ভেবে নেয়। তারপর এ নিয়ে কলাবাজি এবং গলাবাজি দুটোই প্রচুর পরিমাণে চলতে থাকে এবং এগারোশো-বারোশো বছর পরে আকবরের আমলে সেই সংগীত যে কী অবস্থায় ছিল তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে সেই সংগীত যে বিকৃত, কৃত্রিম, স্থানু প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, না হলে তানসেন বা হরিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব কী করে প্রমাণিত হতে পারে। আকবরের দরবারে তানসেন সংগীতের এই কৃত্রিমতা দূর করার লক্ষ্যে আবার সাধারণ মানুষের কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সে সিন্ধু থেকে সিন্ধু, পাহাড় থেকে পাহাড়ি, মালব থেকে মালব এবং আরও অনেক গ্রাম্য রাগরাগিণীর সহযোগে হিন্দুস্থানি সংগীতের জন্ম দেয়। তানসেনের পর অনেক প্রজন্ম কেটে যায়, ভদ্র শ্রেণি এবং তাদের আশ্রিত সংগীতজ্ঞদের মাথায় আবার সেই বদখেয়াল

চাপতে লাগল যার ফলে তারা সংগীতকে তার মুখ্য ধারা অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে যোগযোগ, সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। ফলে সেই সংগীত আবারও কৃত্রিম, মৃতবৎ অবস্থায় আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। পাছে কেউ আনাড়ি বলে, সেই আশঙ্কায় আমাদের গলাবাজ ওস্তাদেরা প্রাণপণ গলাবাজি করে চলেছেন কিন্তু এরকম করে খুব বেশিদিন চলবে না। প্রগতি এখানে রুদ্ধ, তাকে আবার গতিশীল করতে হলে যেতে হবে লোকসংগীতের কাছে। নৃত্যের ক্ষেত্রেও সেই একই কাজ করতে হবে। যে কাজে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও, উদয়শঙ্কর আরম্ভ করে দিয়েছেন।

প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের এই পথে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মিথ্যা দম্ভে ভরা, অযথা উঁচু মোমের নাকটিকে নামিয়ে আলাদা করে ফেলতে হবে। তাদের বুঝতে হবে যে প্রগতি স্রোতের উৎস তাদের মস্তিষ্ক নয়। উৎস জনতা এবং প্রগতি সেখান থেকেই তার রসদ সংগ্রহ করে। প্রগতিশীল লেখকদের, তাদের প্রতিভার বিকাশ এবং রচনাভ্যাসের জন্য যাদের সহায়তা নিতে হবে তারা হল সাধারণ জনতা। সামন্ত ও পুঁটলিশাহিদের কালকে পিছনে ফেলে, তাদের এগিয়ে যেতে হবে আরও অনেক বড়ো দরবারের দিকে, তাদের হয়ে উঠতে হবে জনগণেরই একজন, মনে রাখতে হবে ভবিষ্যৎ কিন্তু জন-সাধারণের। ধোপদুরস্ত ভদ্রজনেরা তাদের নিস্কর্মা বৃত্তি, শয়তানি মতলব এবং ধর্মান্ধতার অনেক নমুনা সমাজে এ যাবৎকাল উপস্থিত করেছে তা সত্ত্বেও যদি কেউ তাদেরই দিকে আশ্রয়ের জন্য তাকিয়ে থাকে, তাহলে শয়তান তাকে রক্ষা করুক। প্রগতিশীল শিল্পীদের সাফল্য, বিফলতা একমাত্র জনগণের বিচারের কষ্টিপাথরেই সত্যকার যাচাই হতে পারে। কারণ সেখানে অনুরোধ, আবদার বা সুপারিশে কাজ হয় না। প্রগতিশীলদের এটা বুঝতে হবে যে তারা তখনই সফল যখন জনতা তাদের সফলতাকে স্বীকৃতি দেবে। প্রাচীন দেবতাদের ভাষা কিংবা বাণী এখানে অকার্যকর। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে জনতার ভাষাকে নিজের ভাষা করতে হবে। এমন মানুষ খুবই কম, যার মাতৃভাষা কোনো জনভাষা নয়। আমাদের অনেক বন্ধু, ভদ্রলোকদের দ্বারা 'দুরছাই' করা এই ভাষাকে নিছক 'বুলি' আখ্যা দিয়ে এর অবমূল্যায়ন করতে চায়। তাদের ধারণা, উত্তর ভারতের বিশ কোটি মানুষ খুব তাড়াতাড়ি তাদের মাতৃভাষা ভুলে হয় হিন্দি না হয় উর্দুর শরণ নেবে। বিগত চল্লিশ বছরের অবস্থা পর্যালোচনা করলে তারা এই ভুল করত না। পণ্ডিত উদয় নারায়ণ তেওয়ারি আমাকে বালিয়া সম্বন্ধে বলেছিলেন যে ওখানকার শিক্ষকেরা হাই স্কুলে হিন্দি বা উর্দুতে নয়, মাতৃভাষাতেই বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি ইত্যাদি পড়াচ্ছেন। চল্লিশ বছর ধরে এই সব স্থানীয় ভাষাকে শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে রাখার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সফল হয়নি। হিন্দির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, সে এখন আমাদের আন্ত-প্রাদেশিক ভাষা, কোনো প্রচার বাহুল্যতে ভর করে সে এই জায়গাতে আসেনি। সমস্ত দেশকে এক সূত্রে গাঁথার যে আধুনিক চিন্তা আমাদের মনে উদয় হয়েছে তারই ফলশ্রুতি হিসেবে হিন্দির এই সম্মান। আধুনিক যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা এবং আরও অনেক মাধ্যম

আমাদের দেশের প্রতিটি প্রদেশকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছে এবং এর ফলেই একটি সম্মিলিত যোগাযোগের ভাষার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হতে থাকে। বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলন এবং মহাত্মা গান্ধির হিন্দুস্থানি আন্দেলনেরও শতাধিক বছর আগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চি, উজ্জয়িনীতে তীর্থ যাত্রা কালে হিন্দির ব্যবহারিক উপযোগিতা দেখিয়ে দিয়েছে। যারা মাতৃভাষার নাম শুনলেই আতঙ্কিত হয় আর ভাবতে থাকে এই বুঝি হিন্দি ভাষা ধ্বংশ হয়ে গেল তাদের জনগণের শক্তির উপর কোনো আস্থা নেই, জনগণকে তারা শুধু উপেক্ষাই করে, এখন এক-একটি প্রদেশের মানুষ নিজ নিজ প্রদেশে এক-একটি শামুকের খোল তৈরি করে তার মধ্যে ঢুকে থাকতে পারে না, অতএব একটি আন্ত-প্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষার অবশ্যই প্রয়োজন। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক দৃষ্টিতে দেখলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে হিন্দি এবিষয়ে যথেষ্ট কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে এবং তার ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে হিন্দির বেদিমূলে মাতৃভাষাকে বলি দেয়ার স্বপ্ন নেহাতই স্বপ্ন। যদি কোনোদিন সেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে তার অর্থ হবে দেশের প্রগতি আন্দোলন থেকে জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখা। সাহিত্যে প্রগতিশীলতার কাছে আমাদের দাবি যে সে যতটা প্রসারিত হয় হোক, কিন্তু শিকড় যেন গভীরে থাকে। দেশের যতটা বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হবে যেন ততটাই প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের কাছেও পৌঁছায়। এজন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে সথাসম্ভব তাড়াতাড়ি দেশের মনুষকে শিক্ষিত করে, সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদনে সক্ষম করে তুলতে হবে। এছাড়া কোনো বিকল্প নেই। সংগীতের প্রগতিশীলতা দাবি করে যে আমরা যেন লোকসংগীতের সঙ্গে আমাদের সংগীত প্রতিভাকে যুক্ত করে নতুন এক সংগীত সৃষ্টি করি। নৃত্যকলার প্রগতি এই দাবি করে যে আমরা অশ্লীল, দরবারি, প্রাণহীন নৃত্যের বদলে লোকনৃত্য, আহির নৃত্য ইত্যাদিকে কলাক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে নিয়ে আসি। জনগণের শক্তিকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের প্রগতির পথে চলতে হবে, আজকের সাহিত্যিক, শিল্পী, সমালোচক সকলেরই এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আজকের সাহিত্যিক

আজ অবন্তি তথা মালব গণের প্রাচীন ভূমিতে আমাদের মধ্য ভারতের তরুণ কবি ও লেখকেরা একত্রিত হয়েছেন। অবন্তি কে ? যারা মগধেরও আগে সমস্ত ভারতবর্ষকে এক সূত্রে গাঁথার চেষ্টা করেছিল। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা, বুদ্ধের সমসাময়িক প্রদ্যোত মহাসেন—যাকে চণ্ড প্রদ্যোতও বলা হত—তিনি বোধহয় দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার একটা প্রয়াস করেছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের এক বাহু মথুরা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, যেখানে প্রদ্যোত তাঁর ভাগিনেয়কে শাসনকর্তার পদে বসিয়ে ছিলেন, আর দ্বিতীয় বাহু প্রয়াগ হয়ে কৌশাম্বী পর্যন্ত কিস্তৃত ছিল, সেখানে তাঁর জামাতা কুরুবংশীয় মহারাজ উদয়নের শাসন ছিল। বিম্বিসারের মৃত্যুর পর ভাবী মগধ মহাসাম্রাজ্যের সূত্রধার অজাতশত্রু প্রতিমুহূর্তে প্রদ্যোত মহাসেনের পক্ষ থেকে সামরিক আগ্রাসানের আশঙ্কা করতেন। সেই আশঙ্কায় অজাতশত্রুর মহামন্ত্রী রাজধানী রাজগৃহকে এক দুর্গে পরিণত করার কাজে ব্যস্ত ছিল। তখন অবন্তি আর মগধের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত, কে হবে মহাভারতের একছত্র অধিপতি।

ভারতের জনপদগুলির সীমান্ত ভেঙে এক বিস্তৃত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ার প্রশ্নটা ছিল সময়ের দাবি। পারসিক শাহানশাহ দারায়ুস সিন্ধু নদের তটভূমি পর্যন্ত পৌঁছে এই বার্তাই ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপ, এই তিন মহাদেশের সম্মিলিত শক্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ঐক্যবদ্ধ হও, অন্যথায় তোমাদের এই প্রাচীন দেশেরও সেই হাল হবে, যে হাল হয়েছে কাবুল অথবা মিশরের। জম্বুদ্বীপের —তখন ভারতবর্ষের এই নামই ছিল—সামনে তখন একটাই পথ হয় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাঁচো না হলে বিচ্ছিন্ন থাকো এবং ধ্বংস হও। ইক্ষাকু এবং তার থেকেও রাজবংশ কোশল এবং বৎসের যোদ্ধারা তাদের প্রাচীন পরম্পরা এবং ব্যবস্থার বোঝার ভারে এতই ভারাক্রান্ত ছিল যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার চেয়ে কোনো শাক্তিশালী রাজার শ্যালক কিংবা জামাতা হয়েই সন্তুষ্ট ছিল। বজ্জি (বৈশালী) এবং উত্তরাপথ ছিল গণরাজ্য, সেখানে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল এবং তার ফলে নতুন নতুন শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার ছিল সেখানে। কিন্তু যেহেতু তাদের সমস্ত ব্যবস্থাটাই ছিল রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে, তার ফলে তাদের সীমা আরও প্রসারিত হওয়া সম্ভব ছিল না—গণরাজ্যের যোদ্ধা প্রতিপক্ষের সৈনিকদের সঙ্গে জোরদার মোকাবিলায় দক্ষ ছিল, কিন্তু শত্রুরাজ্য জয় করে সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা তাদের সাধ্যাতীত ছিল। পরাজিত দেশের শাসক-পদে অধিষ্ঠিত করে

গণরাজ্যের কোনো নাগরিককে সেখানে পাঠালে তাকে রাজতন্ত্রের প্রলোভন থেকে রক্ষা করা কঠিন কাজ ছিল। অর্থনৈতিক সাম্যবাদের সময় তখনও বহু শতাব্দী দূরে এবং সেই সময়কে ইতিহাসের অনিবার্য কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করার প্রয়োজন ছিল।

ভারতের একত্রিকরণের লক্ষ্যে অবন্তি ও মগধ, প্রাচী ও প্রতীচির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলত, কিন্তু ইতিহাস সাফল্যের মুকুট অবন্তির মাথায় না চড়িয়ে মগধের শিরে পরায়, এটি বলা অতিরঞ্জন হবে, যদি কেউ বলে এই একত্রিকরণের কাজে শুধু মগধের তরবারিই সক্রিয় ছিল, অবন্তির হৃদয় এবং প্রতিভার ভূমিকা ছিল না। সম্রাট অশোক দীর্ঘকাল অবন্তির যুবরাজ পদে অসীন থেকে শুধু শাসনকার্যই শেখেননি তাঁর সেই ধর্মবিজয়ের বীজ অবন্তিতে থাকাকালীন সময়েই হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, কলিঙ্গ যুদ্ধের পর সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে পত্র পল্লবে ছেয়ে যায়। ইতিহাসে অশোকের ধর্মবিজয় সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু পড়ি কিন্তু সেখানে একটা বিষয় উপেক্ষিত থেকে গেছে যে এই শ্রেয় অশোকেরও দুই শতাব্দী আগে প্রদ্যোত মহাসেনের পুরোহিত কাত্যায়নের প্রাপ্য। কাত্যায়নই প্রথম বুদ্ধের শিক্ষা ও বাণীকে যা ছিল সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রগতিশীল, তাকে মধ্যদেশের বাইরে ছড়িয়ে দেন। দক্ষিণাপথে ও ধর্মবিজয়ের লক্ষ্যে কাত্যায়ন যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, সেখানে তরবারির কোনো স্থান ছিল না, ছিল সেবাধর্ম পালন এবং জ্ঞান বিস্তারের আগ্রহ। মগধের তরবারি সেদিন তার আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে পারত না, যদি না অবন্তি তাকে নিজের অস্ত্র প্রদান করত। অশোকের ধর্মবিজয়েও অবন্তির প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। বুদ্ধের বাণীর সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির বার্তা সিংহল দ্বীপে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য আশোকের পুত্র কুমার মহেন্দ্রর এগিয়ে আসা আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। মহেন্দ্র তাঁর মায়ের দিক থেকে অবন্তি এবং দর্শান (বুন্দেলখণ্ড)-এর সন্তানই শুধু নন, কুমারের শিক্ষাদীক্ষাও হয়েছিল অবন্তিকাপুরীতে।

এরপর কেটে গেল আরও দুই তিন শতাব্দী। দেশে যবন-গ্রিকরা এল। একজন তো অবন্তির শাসকও হয়েছিল। এই সময়েই ভারতের প্রাচীন এক বীর জাতির গণারজ্য, শকদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করে দেখিয়ে দেয় যে ভারতের গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র থেকে কোনো অংশেই পশ্চাদপদ নয়। মালবের এই গণ তাদের বিজয় উপলক্ষ্যে এক সম্বত চালু করে, যাকে আজ আমরা বিক্রম সম্বত বলি। মালবগণ প্রচীন অবন্তিকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র দেয়, সময়ের প্রতিকূলতার কারণে যা চিরস্থায়ী হয়নি। তারা অবন্তির মাটিকে নতুন নাম দেয় এবং আজও অবন্তি সেই মালব নামেই পরিচিত। কে বলতে পারে জনতার এই নবজাগরণের যুগে, মালবের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া জনগণ, আবার এক শক্তিশালী গণরাজ্য, মালব গণরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে না। কত ভালো হত যদি মালব গণের

দ্বিসহস্রাব্দী পূর্তি উৎসব কোনো বিক্রমাদিত্যের বিজয়স্তম্ভ স্থাপন না করে, গণ প্রতিষ্ঠা করে করা যেত।

এটা তো গেল রাজনৈতিক দিক, কিন্তু সাহিত্যিক দিক! সেটাও কিন্তু ইতিহাসের ঘটনার চেয়ে কম গৌরবময় নয়। অবন্তিদুহিতা বাসবদত্তা কুরুবংশকে হয়তো রাজচক্রবর্তী করতে পারেননি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কবিরা অনুপম প্রেরণা লাভ করেছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে, উদাত্ত নায়িকা হবার সৌভাগ্য প্রদ্যোত দুহিত বাসবদত্তারই হয়েছে। কবি গুণাঢ্যের বৃহৎকথাতেও বাসবদত্তার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বাসবদত্তা ও রাজা উদয়নের প্রেম কাহিনি নিয়ে অনেকেই কাব্য অথবা নাটক রচনা করেছেন। কালিদাসও তাঁর নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্রম'-এ নায়িকা মালবিকার মধ্যে বাসবদত্তাকেই চিত্রিত করেছেন। শুধু বাসবদত্তাই কেন, অবন্তিপুরিতে দ্বিজ সার্থবাহ চারুদত্তের মতো নবরত্নের জন্ম হয়েছে, সমাজে চির অবহেলিত রূপোপজীবিনী বসন্তসেনার মতো নারীরত্নকে দিয়েছে। বাণভট্টকেও তাঁর কাব্যের নায়িকা চরিত্র খুঁজতে পাটলিপুত্র, বারাণসী, সাকেত, কান্যকুব্জ, ছেড়ে অবন্তিপুরিতে আসতে হয়েছে এবং তার ফলেই তাঁর সৃষ্ট কাদম্বরী ওরকম অনুপম সুন্দর হয়েছে।

এই সামান্য বক্তব্য থেকে আমি বোঝাতে চাইছি যে আমাদের সাহিত্যে মালব ভূমির স্থান কোথায় এবং আমাদের সাহিত্যের অমর স্রষ্ঠা মহাকবি কালিদাস, তাঁর মানসপ্রতিমা শকুন্তলাকে এই মালব ভূমিতেই জন্ম দেন। মালবের মাটি বহু শতাব্দী ধরেই মানুষের বৌদ্ধিক উন্নতির এক উর্বর ক্ষেত্র ছিল। মালবের ভূমি অন্নের খনি। সেখানে কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না। আমার তো মনে হয় এখনও মালবের মাটি থেকে বৌদ্ধিক উর্বরতা হারিয়ে যায়নি। তার ভবিষ্যতের গর্ভে আবারও কোনো কালিদাসের জন্ম নির্দিষ্ট হয়ে আছে, অপেক্ষা করে আছে মহান সংস্কৃতির বার্তাবহ নতুন কোনো কুমার মহেন্দ্র। মহান বিজয়ী মালবগণ আবার ঐক্যবদ্ধ হোক।

এই পবিত্র মালব ভূমিতে আমরা লেখকেরা একত্রিত হয়েছি স্রেফ একজন সাহিত্যিক, শুধুমাত্র এই পরিচয়ে নয়, বরং ভবিষ্যৎ সাহিত্য আমাদের হাতেই নির্মিত হবে, এই অধিকারে। বস্তুত সাহিত্যিকদের ভবিষ্যৎ নির্মাতাদের চেয়ে আলাদা করা যায় না। সাহিত্যিক প্রকৃত পক্ষে কী করে? যুগ যুগান্তের সঞ্চিত সম্পদকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমাদের তার উত্তরাধিকারী করে, আবার তার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করে যা হয় আমাদের ভবিষ্যতে চলার পথের পাথেয়। সাহিত্যিকদের সৃষ্টিই আমাদের প্রাণে প্রেরণা জোগায়। তার সৃষ্টির মধ্যে যে সমস্ত ধ্বনি জন্ম নেয় সেই ধ্বনি ভবিষ্যতেরও দিক নির্দেশ করে। ভবিষ্যৎ নির্মাণের কর্মকাণ্ডে সে স্বয়ং অথবা তার উত্তরাধিকারী রূপেও

সে উপস্থিত থাকে। শুদ্রক তাঁর 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে এই প্রেরণাতেই আর্যক ও চারুদত্ত, এই দুই চরিত্রের মাধ্যমে অপশাসন উচ্ছেদের দিক নির্দেশ করেছেন।

আমাদের সাহিত্যিকদের উপরেই দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষার গুরুভার অর্পিত রয়েছে। এই সম্পদ একদা বাল্মীকি, অশ্বঘোষ,ভাস, কালিদাস, শুদ্রক, ভবভূতি, বাণভট্টরা রক্ষা করেছেন। এই সম্পদকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুই হাতকে প্রবলভাবে নব-নির্মাণেও অংশ নিতে হবে। একদিকে সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা, অন্য দিকে নব-নির্মাণ, এই দুই আকাঙ্ক্ষা আমাদের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী করে তোলে। আফশোশ হয় যখন দেখি আমাদের দেশের অনেক সাহিত্যিক এটা বুঝতেই চান না যে ফ্যাসিবাদ বিশ্বের সমস্ত জাতির সংস্কৃতি ও নব-নির্মাণের কত বড়ো শত্রু। জার্মান ফ্যাসিবাদের সিদ্ধান্তগুলি তাদের একনায়ক হিটলারের আত্মজীবনী 'মাইনক্যাম্প'-এ অনেকেই পড়েছেন, তারপরও যদি তাঁরা আশঙ্কিত না হন, তাহলে আমরা কী বলতে পারি। ফ্যাসিস্টরা তলস্তয়ের আশ্রমকে —বিশ্বের সেই অমর সাহিত্যিকের সমাধিকে ধ্বংস করেছে। সেই ফ্যাসিস্ট দানবদের কাছ থেকে আমাদের রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের জন্য আমরা কি আশা করতে পারি? ফ্যাসিস্টরা সুযোগ পেলে রবীন্দ্রনাথের উত্তরায়ণকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করবে না, কে বলতে পারে? জার্মান আর জাপানি ফ্যাসিস্টরা কি কবিগুরুর স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি জ্বালিয়ে চায়ের জল গরম করবে না? তারা ফ্রান্স, রাশিয়া, পোল্যান্ড, সর্বত্র এমনই করেছে। প্রাচ্যে কোরিয়ার ওপারে একশো বছর ধরে কী ঘটেছে, ইতিহাসের পাতায় তার বিবরণ আমরা পড়েছি। আর চিনে তাদের দানবীয় কাণ্ডকারখানার স্বরূপ তখনই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যখন আমাদের মহান কবি ফ্যাসিস্ট জাপানের কবি নোগুচিকে, তাঁর বজ্রলেখনীর মাধ্যমে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন।

ফ্যাসিস্ট জার্মান এবং জাপান কোন্ ক্রূর ও ঘৃণিত উদ্দেশ্যে বিশ্ববিজয়ে বেরিয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে এখানে বলার সুযোগ নেই। আপনারা জানেন যে আর্য আখ্যা নেয়া ফ্যাসিস্ট জার্মানই হোক কিংবা সূর্যদেবীর সন্তান আখ্যায়িত ফ্যাসিস্ট জাপানই হোক, এরা মনে করে বিশ্ব শুধু মাত্র তাদরেই জন্য। স্লাভ কিংবা ইংরেজ, ফরাসি কিংবা গ্রিক, এদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার তত দিনই, যতদিন না জার্মান মায়েরা সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রয়োজন মতো সন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম হচ্ছে। জার্মান ফ্যাসিস্টদের দৃষ্টিতে তারা ছাড়া বাকি ইওরোপের মানুষই বর্ণসংকর এবং পশুমানব, তখন এশিয়ার কালো চামড়ার মানুষের প্রতি তাদের মনোভাব কী হবে, তা জিজ্ঞেস করাই বাহুল্য। এই প্রভু জাতির দাসত্ব করার জন্যই নাকি আমাদের জন্ম। হিটলার যা ঘোষণা করেছিল, বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি রক্তপাত, ধ্বংসলীলা সে চালিয়েছে রাশিয়া ও ইওরোপের অন্যান্য দেশে। জাপানের নববিধানে তাদের সেই ক্রূর ভাবনাকে গোপন রাখতে পারেনি। যে

ক্রূরতা তারা এযাবৎ দেখিয়ে এসেছে চিন ও কোরিয়াতে। নৃতত্ত্ব, ধর্ম এবং সংস্কৃতির দিক থেকে চিন, জাপান এবং কোরিয়া যত কাছাকাছি, ততটা আমরা নিশ্চয়ই নই। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল, মৌলানা আজাদের সঙ্গে জাপানি ফ্যাসিস্টরা কোরিয়া, চিনে যা করেছে, তার চেয়ে ভালো ব্যবহার করবে এরকম আশা একমাত্র তারাই করতে পারে যাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। হিটলার তথা জার্মান ফ্যাসিস্টরা ইওরোপে তাদের বিজিত দেশগুলিতে কি করেছে তা কি তাদের অজানা? জাপানি ফ্যাসিস্টদের নববিধানেরও উদ্দেশ্য সারা বিশ্বে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করা। মনে নেই তাদের নেতা তাশাকা কী বলেছিলেন—প্রথমে চিন এবং তার চারপাশ, তারপর ভারতবর্ষ, এভাবেই সারা পৃথিবী জুড়ে স্থাপিত হবে সূর্যদেবীর সন্তানদের শাসন। এই উদ্দেশ্য পূরণের পথে যারাই বাধা হবে তাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে ঘৃণিত এবং যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। এখানেই শেষ নয়, জার্মান ফ্যাসিস্টদের মতো জাপানি ফ্যাসিস্টরাও মনে করে এই পৃথিবী শুধু সূর্যদেবীর সন্তানদের বাসভূমি হবে। অন্যান্য জাতি, দাসত্ব স্বীকার করলেও ততদিনই জীবিত থাকতে পারবে— যতদিন না জাপানি মায়েরা প্রচুর পরিমাণে শুদ্ধ জাপানি রক্ত বাহিত সন্তানের জন্ম দিয়ে তাদের শূন্য স্থান ভরিয়ে দিতে পারবে। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা, লুপ্ত হয়ে ফ্যাসিস্টদের জন্য বিশ্বকে খালি করে দিতে বাধ্য থাকবে। এই পরিবেশে জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদের রক্ষা এবং নব-নির্মাণ কী ভাবে সম্ভব? আমাদের সাহিত্যিকদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখতে হবে, বুঝতে হবে মানবতা আজ কোন্ ভয়ংকর দানবের মুখোমুখি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থা অনুভব করেছেন এবং তিনি আমাদের পথনির্দেশও করেছেন। বিদেশি শাসনের যন্ত্রণার কাঁটা তাঁকেও অন্যদের চেয়ে কম বিদ্ধ করেনি। দেশের স্বাধীনতার জন্য অধীর জওহরলাল— তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, লেখক—জওহরলাল—কেন ফ্যাসিস্টদের প্রতি এত ঘৃণা পোষণ করেন। কারণ ফ্যাসিস্টদের কাছে আমাদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পদের কোনো মূল্য নেই, আমাদের সমাজের নব-নির্মাণের কোনো আশা নেই, এমনকি আমাদের চল্লিশ কোটি মানুষের তাদের মাতৃভূমির বুকে বেঁচে থাকারও কোনো অধিকার নেই।

ফ্যাসিস্ট বর্বরতা যখন বহুযুগের সঞ্চিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল এবং মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করতে উদ্যত, যখন ক্রৌঞ্চমিথুনের যন্ত্রণার চেয়েও ভয়ংকর যন্ত্রণা ভোগ করছে লক্ষ লক্ষ শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সেই অবস্থায় আমাদের যথার্থ ভূমিকা পালন করে প্রমাণ করতে হবে যে আমরাই আমাদের পূর্বজদের যথার্থ উত্তরাধিকারী।

ফ্যাসিস্টদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অবস্থান আমরা কখনোই গ্রহণ করতে পারি না। আমাদের হৃদয় এর বিরোধী, আমাদের সাংস্কৃতিক পরম্পরা, ঐতিহ্য একে স্বীকার করে না। আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের জাতীয় স্বার্থ তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করে।

অত্যাচারীর প্রতি ঘৃণা এবং অত্যাচারিতের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার এক যথার্থ সুযোগ আমাদের কাছে এসেছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের অস্ত্র হাতে দীরত্ব প্রকাশের ঘটনাকে লেখনীর মাধ্যমে জীবিত করে তোলার এক অবসর আমরা পেয়েছি। ফ্যাসিবাদের যে দানবীয় রূপ আমাদের সামনে প্রতিদিন উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, তখন তার চেয়ে প্রেরণাদায়ক আর কোন্ ঘটনা হতে পারে। স্তালিনগ্রাদের বীরদের বীরত্বগাথা যুগ যুগ ধরে কবি সাহিত্যিকদের বীরত্বব্যঞ্জক রচনা লিখতে অনুপ্রাণিত করবে। আমরাও স্তালিনগ্রাদের ওই মহাপ্রতিরোধ সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন নই। স্তালিনগ্রাদের বীররা শুধু স্তালিনগ্রাদ এবং রাশিয়ার ভোল্‌গা মাকেই রক্ষা করেনি, তারা সর্বজাতির সংহারক জার্মান ফ্যাসিস্টদের হাতে অপবিত্র হওয়া থেকে আমাদের গঙ্গা মাকেও রক্ষা করেছে। জার্মান ফ্যাসিস্টরা যদি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে পিছনে ফিরে পালাতে বাধ্য না হত, তাহলে ভোল্‌গা পার হয়ে তাদের এই গঙ্গা পর্যন্ত আসা কে রুখতে পারত? মানবতার সমস্ত কোমল অনুভূতি, জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যবহারিক চিন্তা, আমাদের কাছে দাবি করে যে, স্তালিনগ্রাদের বীরত্বের কাহিনি আমাদের কবি, সাহিত্যিকদের হৃদয়েও অনুরণিত হোক। মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হতে পারে এমন রসদ এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যত আমাদের কাছে এসেছে, বোধ হয় অতীতে কখনও আসেনি।

আমাদের সাহিত্যকে শুধু ধ্বনিত হয়ে থেমে গেলেই হবে না। সাহিত্য শুধু কল্পনা-জগতের বস্তু নয়, এটি এক বিশাল শক্তি। হ্যাঁ, এ শুধু কল্পনা জগতের বস্তু হয়েই থাকতে পারে, যদি এ মূল ছেড়ে শূন্যে ভাসমান হয়। যে মুহূর্তে সে মাটির কঠিন ভিত্তির সংস্পর্শে আসে তখনই তার মধ্যে প্রচণ্ড এক জাগতিক শক্তির লক্ষণ দেখা যায়। এই জাগতিক শক্তি লাভের ভূমি হল সাধারণ জনতা। সমর বিজ্ঞানের সমস্ত সিদ্ধান্ত কাগজে কলমেই আটকে থাকবে, যতক্ষণ না তার সঙ্গে সাধারণ সৈনিকের বাহুবল এবং মস্তিষ্ক যুক্ত হচ্ছে। মানব জাতির হিতৈষীরা বহুযুগ ধরে একটা সভ্য সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখে আসছেন। তাঁরা তাঁদের সময়ের দারিদ্র্য, বৈষম্য এবং মৃত্যুর মিছিলের পরিবর্তে এক সুন্দর পৃথিবীর জন্ম দিতে চেয়েছেন, তাঁদের সমস্ত শুভ ইচ্ছা, স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে গেছে যতদিন না বিপ্লবী দার্শনিক কার্ল মার্কস এবং মহামতি লেনিন সমস্ত সাম্যবাদী চিন্তাধারাকে কৃষক, মজুরের শ্রেণি স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে এক সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করার পথ দেখিয়েছেন। আজ সাহিত্যিকদের সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং দিব্যদৃষ্টিকে সেই জনগণের সঙ্গে জুড়তে হবে। জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হলেই সমস্তটা একটি মহান শক্তিতে রূপান্তরিত হবে, যার সাহায্যে একদিকে ফ্যাসিস্ট দানবের মোকাবিলা, অন্যদিকে দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদকে রক্ষা করে নব-নির্মানের পথে এগিয়ে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকেও পালটে দেয়া যেতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী , যুগে যুগে সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে সাহিত্যিকরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ

ভাবে সামিল থেকেছেন। আজও নব-নির্মাণ ও সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যাঁরা সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার অনুরোধ, পরিবর্তন সাধনের প্রকৃত ক্ষমতা যাদের হাতে সেই জনশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন। এই বিশাল জনসমষ্টিই একমাত্র আমদের পথকে প্রশস্ত করতে পারে।

একটা সময় ছিল যখন সামন্তবাদের মজলিশের জো-হুকুম লেখকদের মধ্যেও কেউ কেউ পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ের সাহিত্যিকরা তো আর কোনো ভাবেই দরবারি কিংবা মজলিশি সাহিত্যিক নন, তাঁরা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার মুদ্রাযন্ত্র, কাগজকল, বেতার, নির্বাক ও সবাক চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে যত বেশি সংখ্যক জনতার কাছে পৌঁছতে চান। সেই কারণে আজকের সাহিত্যিক, বর্তমান পরিস্থিতিতে গণসাহিত্যিক ছাড়া আর কিছু হতে পারেন না। জনশক্তির মধ্যে তাঁকে আবেগ এবং উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। সংগ্রামের ময়দান থেকে জনগণকে পালিয়ে যাবার কথা তিনি বলবেন না, বরং বিশাল জনগণের সহযাত্রী হয়ে অগ্রসর হয়ে সংগ্রামের পথে, জন সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করবেন। নব-নির্মাণ শক্তির তিনি হবেন সহকারী। আজ আর তিনি পৃথিবীর ব্যাখ্যাতা নন বরং তিনি আজ পৃথিবীকে বদলে দেবার সংগ্রামের সাথী। আজ তাঁর সামনে বিশ্বের পরিবর্তন ঘটানোর যে সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে, তেমন সুবর্ণ সুযোগ, এর আগে আর কোন্ যুগে এসেছে? আজ তাঁর সমস্ত স্বার্থ মহত্ত্বাকাঙ্ক্ষা জনতার স্বার্থের সঙ্গে পূর্ণরূপে নিহিত, সেজন্য আজ নিজের ক্ষুদ্র, তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে তাঁর ভাবার অবসর নেই, আজ তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে সমগ্র জনসমাজের হিতার্থে গভীর নাদ করতে পারেন।

গণ-সাহিত্যিক কী ভাবে এই চিরপুরাতন এবং চিরনতুন জনশক্তির সঙ্গে অটুট সম্পর্ক স্থাপন করবেন? এজন্য তাঁদের জনতার ভাবকে বুঝতে হবে। তার মধ্যে সমস্ত উপযোগী রস সঞ্চারের জন্য জনভাষাকে সাফল্যের সঙ্গে সাহিত্যে ব্যবহার করতে হবে। আমাদের বক্তব্যকে এমন কোনো ভাষার মোড়কে মুড়ে উপস্থিত করা উচিত নয় যাকে জনসাধারণ সঠিক ভাবে উপযোগই করতে পারল না। এর মানে অবশ্য এই নয় যে সাহিত্যিকেরা জনতার চেতনার মানকে উন্নত করার চেষ্টা করবেন না। সাহিত্যিকেরা জনগণের বিশ্বস্ত সঙ্গী সেই সঙ্গে তাদের পথিকৃৎও। তাঁরা একাধারে সৈনিক ও সেনাপতি। আজকের সেনাপতি এবং পথিকৃৎ তখনই তাঁর কর্তব্য সঠিক ভাবে সম্পূর্ণ করতে পারে, যদি জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হন। যদি তিনি তাঁর নিজস্ব শ্রেণির খোলস ভেঙে ডিম থেকে ছানা বেরিয়ে আসার মতো আসতে পারেন, জনতার নাড়ির স্পন্দনে, হৃদয়ের উত্তাপে, তার মস্তিষ্কে ক্ষণে ক্ষণে ওঠা ভাবতরঙ্গে সামিল হতে পারেন, তাহলে তাঁর দ্বারা মহৎ সাহিত্য

সম্ভব। জনতার জীবন থেকে তিনি প্রেরণা নিতে পারেন। আমরা কি আমাদের চারপাশের ঘটনাক্রম থেকে চোখ বুজে, মানবতার আর্তনাদ শুনে বধির হয়ে থাকতে পারি? যদি জনশক্তিতে আমাদের আস্থা থাকে তাহলে আমাদের নিরাশ হবার প্রয়োজন নেই। যে দুর্জয় শক্তি ফ্যাসিস্ট কালো মেঘে ঢাকা আকাশকে তার নীল সৌন্দর্য ফিরিয়ে দিয়ে বিশ্বমানবতার কাছে এক অমোঘ আশার বার্তা পাঠিয়েছে, সেই অমোঘ শক্তিই আমাদের ভবিষ্যতের গ্যারান্টি।